সাধারণ সূচী।

বিশেষ সূচী।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উৎসর্গ পত্রে	১২	আরম্ভ্র	আরম্ভ
৸৶০	১৯	অপাসঙ্গিক	অপ্রাসঙ্গিক
১৫	৪	েস্তাবে	প্রস্তাবে।
৩৭	১০	বলে	রলে
৫০	১১	স্বর্ণের	স্ববর্ণের
৫০	১৩	সংক্রামিক	সংক্রামক
৫১	৬	তাঁহার	তাঁহাদের
৫৩	৫	বঙ্গারে	বঙ্গাব্দের
৫৪	১	পরাজিত	পরজাতি
৫৪	১০	প্রসাদ	প্রাসাদে
৫৫	১৪	গুণপরিচ্ছদ	গুণপরিচ্ছেদ
৫৭	১	রামপ্রসাদী সুর	এইটী পূর্ব্ব পৃষ্ঠার টীকা
৬১	১২	মালা, এই শব্দ থাকিবে না।	
৬৪	১	জগদীরকে	জগদীশ্বরীকে
৮১	১৪	সতীত্বের	সঙ্গীতের

THE BAGHBAZAR READING LIBRARY

স—৩৩

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রসাদ-প্রসঙ্গ তৃতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। প্রায় দুই বৎসর হইল ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষ হইয়াছে। অপরিহার্য্য ঘটনাধীনে ইহা যথা সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে পারে নাই এবং এই তৃতীয় সংস্করণ কার্য্যের অধিকাংশ আমার হস্তে হইতে পারে নাই বলিয়া যে যে স্থলে টীকা ও সংশোধন করিব মনে ছিল তাহা সম্পন্ন করিতে পারি নাই। এবার মাত্র তিনটী নূতন সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে এবং শেষ ভাগের কয়েকটী সঙ্গীতে নূতন টীকা সংযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাগজে মুদ্রিত করতঃ মলাট বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়য়াছে সুতরাং মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।

১লা কার্ত্তিক
১২৮৯
কলিকাতা

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

তিন বৎসরেরেরও অধিক কালের পরিশ্রমের আজ পরিসমাপ্তি হইল। আজ "প্রসাদ প্রসঙ্গ" সাধারণ্যে প্রচারিত হইল। আমার অযোগ্য হস্তে পড়িয়া স্বনাম খ্যাত সাধক ও কবি যদি কলঙ্কিত হইয়া থাকেন, আমার পরিতাপের সীমা রহিল না। কিন্তু কবিরঞ্জনের কবি-মনোরঞ্জন পক্ষে আমি যদি পরিপন্থী না হইয়া থাকি, আমার সকল পরিশ্রম সফল মনে করিব। আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না।

২৫ শে বৈশাখ
১২৮২। } শ্রী—ঘোষ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত "প্রসাদ প্রসঙ্গের" পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত দ্বিতীয়

সংস্করণ বঙ্গবাসীর করে প্রদান করিতেছি। রাম প্রসাদ সকলেরই ভক্তি ও আদরের পাত্র জানিয়াও আমার দোষে অনাদৃত হইবেন বলিয়া নিতান্ত সশঙ্কিত ছিলাম। তদ্রূপ হয় নাই বলিয়াই আমার এত আনন্দ। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসাদ প্রসঙ্গকে প্রথম বার অপেক্ষায় অধিকতর আদরের সামগ্রী করিতে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। তৎপক্ষে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সাধারণের বিচার সাপেক্ষ। পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি ও সুশ্রীকতা সাধন জন্য ব্যয় বাহুল্য বশতঃ কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি। জানিনা প্রসাদ প্রসঙ্গ এবার বঙ্গবাসীর কিরূপ দৃষ্টিতে পতিত হইবে।

১লা মাঘ ১২৮৩। শ্রী—ঘোষ।

উৎসর্গ পত্র

পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে
আমার প্রভূত প্রয়াসের "প্রসাদ প্রসঙ্গ"
উৎসর্গ করিলাম।

মা!

আপনার প্রিয়তম শক্তি-সাধনার সঙ্গীত সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া অনতিবিলম্বেই মনে করিয়াছিলাম যে, আরব্ধ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে পুস্তক খানা আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিব। এক্ষণ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। যে, যে ভাবেই সাধনা আরম্ভ করুক্, অবলম্ব্য পথ, গন্তব্য স্থান, ও প্রাপ্তব্য বস্তু একই। প্রসাদের জীবন তাহার প্রমাণ। এইক্ষণ আপনি এই ক্ষুদ্র উপহারের প্রতি স্নেহের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া গ্রহণ করুণ। এই আমার ঐকান্তিক নিবেদন।

প্রণত

শ্রী—ঘোষ।

প্রসাদ প্রসঙ্গের সমালোচনা।

আমার প্রিয় প্রসাদ-প্রসঙ্গ-কারের প্রিয় পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়গণের কয়েকটী সমালোচনা সূচক মন্তব্য সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রকাশ করিলাম। এ সকল প্রকাশের উদ্দেশ্য এই মাত্র যে ইহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই প্রসাদী সঙ্গীত-কাব্য বঙ্গভাষায় কেমন উপাদেয় সামগ্রী পাঠক তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রসাদী সঙ্গীত কেবল সঙ্গীত ব্যবসায়ীর বা পান্থ-বাহী ভিক্ষুকের কিম্বা "কালীভক্তের" আদরের সামগ্রী নহে, কিন্তু জ্ঞানী, মুর্খ, ধনী, দরিদ্র, সকলের সমান আদরের দ্রব্য। শৈব, শাক্ত, সৌরী, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও মুসলমান মধ্যে যে কেহই পরমার্থ

প্রার্থী, তাঁহার পক্ষেই "প্রসাদ প্রসঙ্গ অমুল্য নিধি।"

নিবেদক

শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী।

মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিউজিক ডাক্তার মহাশয়ের সমালোচনা—

প্রসাদ-প্রসঙ্গ।

এই গ্রন্থখানি সামান্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—১ম। সুদীর্ঘ ভূমিকা ; ২য়। মৃত মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ; ৩য়। ২২৬টী রাম প্রসাদী গান।

আমি এই গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্তে পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। মৃত মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন আমাদিগের বঙ্গ দেশের মধ্যে একজন অতি প্রসিদ্ধ সাধক কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত ভক্তিরসামৃত-সিঞ্চিত শক্তি বিষয়ক গীতাবলী

কোন্ পাষাণ হৃদয়েরও হৃদয় দ্রবীভূত না করে? তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সেই সকল সুধাস্রাবী গীত সমূহ সঙ্গীত ব্যবসায়ী মহোদয়গণের পবিত্র রসনায় স্থান প্রাপ্ত না হইয়া অধুনা সামান্য ভিক্ষুকদিগের অপবিত্র রসনামাত্রাবলম্বী হওয়াতে সংসর্গ দোষে নিতান্ত অপভ্রষ্ট ও বিকলাঙ্গ হইয়া কীটরূপে কবিবরের কীর্ত্তিলতিকার মূল কর্ত্তন করিতেছিল। গ্রন্থকার বহু অনুসন্ধানে, বহু পরিশ্রমে, বোধ করি বহুব্যয়ে মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের সেই লুপ্ত প্রায় কীর্ত্তিলতিকাটীকে পুনর্জ্জীবিতা করিতে যে যত্নবান হইয়াছেন ইহাই আমার সন্তোষের কারণ। এবং তজ্জন্য গ্রন্থকারকে ও গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তিকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দেওয়া সাধারণের কর্ত্তব্য। তবে "দোষাবাচ্যা গুরোরপি"—গ্রন্থকারের এত সতর্কতা সত্বেও স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। কোন কোন গীতে অপ্রাসঙ্গিক কথা রাখিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—প্রসাদ প্রসঙ্গের ১৪ সংখ্যক গীতটীতে কবি প্রায় আদ্যোপান্তে কেবল শতরঞ্চ খেলা সাজাইয়াছেন. সুতরাং সেই খেলার উপযোগী বচনাবলীই ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু মধ্যের দুইটী পদে পাসা খেলায় ব্যবহৃত কথা গুলির সন্নিবেশ যে অপ্রাসঙ্গিক বোধ করি গ্রন্থকারও ইহা স্বীকার

করিবেন, ঐ অংশটুকু ঐ গানের বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে না। * আর গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন রামপ্রসাদ সেন গয়া, গঙ্গা, কাশী ইত্যাদি কিছুই মানিতেন না, এবং তাহার উদাহরণ স্বরূপ কবির কোন কোন গানের অংশ বি শেষ উদ্ধৃতও করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক গানে কবি জগদম্বার নিকট কাশী যাইবার অভিলাষ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। *

পরিশেষে বক্তব্য যে, গ্রন্থকার যেমন কোন কোন গানের কূটার্থ প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টীকা করিয়া দিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে আরও এমন অনেক গান আছে যাহাদিগের ঐ টীকার নিতান্ত আবশ্যক, সে সকল পরিত্যাগ করিবার স্পষ্ট কারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক

* রাজা বাহাদুর এস্থলে যে ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, ইতি পূর্ব্বেই তাহা ধৃত ও সংশোধিত হইয়াছিল। এই সংস্করণের ১৪ ও ১৫ সংখ্যক সঙ্গীতে উভয় পাশা ও দাবা খেলার সঙ্গে উপমিত সঙ্গীত প্রকাশিত আছে। আর যে ৬৪ সংখ্যক সঙ্গীতে প্রসাদের কাশী যাওয়ার স্পষ্ট ইচ্ছা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রসাদী সঙ্গীতই নহে। কমলাকান্তী সঙ্গীত বলিয়া এবার তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

"প্রসাদ প্রসঙ্গ" যে, সাধারণের গৌরবের বস্তু তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যাহাতে একজন প্রধান কবির কীর্ত্তি রক্ষা হইতেছে, এবং অতি আশ্চর্য্য বহুসংখ্যক গীতের সমাবেশ আছে, তাহা কি সাধারণের আদরণীয় নহে? একথা কোন পাষণ্ড স্বীকার করিবে? যদি আমাদিগের দেশের যুবক সম্প্রদায় অতি অকিঞ্চিৎকর কতক গুলা কট্‌কি নাটকি নাটক লিখিয়া আপনাদিগের লেখনীকে দূষিত না করিয়া প্রসাদ প্রসঙ্গ প্রণেতার অবলম্বিত পন্থা অবলম্বনে সমাজে গ্রন্থকার পদে পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে যে, দেশের কত উপকার হইত বলা যায় না।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু
মহাশয়ের সমালোচনা সূচক পত্র—

মেদিনীপুর, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৮ শক।

পরম সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু———ঘোষ
"প্রসাদ প্রসঙ্গ" প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন,

আপনার প্রদত্ত "প্রসাদ প্রসঙ্গ" রূপ অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত বোধ করিলাম। "অমূল্য নিধি" শব্দ

ব্যবহার করিলাম ইহা অত্যুক্তি নহে; বস্তুতঃই এই গ্রন্থ পরমার্থ সাধকদিগের পক্ষে অমূল্য নিধি। কলিকাতায় যখন রাত ভি-কারী দিগের মুখ হইতে রাম প্রসাদের গীত শুনি তখন মনে কি পর্য্যন্ত এক স্বর্গীয় ঔদাস্য ভাবের সঞ্চার হয়, ও তাহাকে পৃথিবীর উপরে কতদূর লইয়া যায় তাহা বলিতে পারি না। * *।

রামপ্রসাদ রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের নিকট হইতে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তদপেক্ষা আর একটী সহস্র গুণে গৌরবাস্পদ উপাধি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত; সে উপাধি "সাধুরঞ্জন"। "কবি" শব্দ "সাধু" শব্দের প্রতিশব্দ হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু মানব বর্গের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই। আপনি প্রসাদ প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়া উভয় কবিদিগের ও সাধুদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আপনার উৎসাহকে ধন্য! অনুরাগকে ধন্য! এই প্রকার উৎসাহ ও এই প্রকার অনুরাগ কেবল কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত আমাদের দেশের বিলুপ্তপ্রায় কবিদিগের কবিতা উদ্ধারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বৈদ্য প্রেমাস্পদ গ্রন্থকার প্রতি এতদ্রূপ গাঢ় অনুরাগ অন্য কেহই প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। * *।

* * অপাসঙ্গিক অংশদ্বয় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আদিব্রাহ্মসমাজের মাননীয় গাথক মহাশয়ের সমালোচনা সূচক পত্র—

অশেষ গুণগ্রাহী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু———

প্রসাদী সঙ্গীত অমৃত রস, যাহা আপনি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ঐ প্রসাদী সঙ্গীত উপহার প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছি তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সঙ্গীত তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যথা সত্ব রজঃ ও তমভাবাত্মিক। এই তিন প্রকার সঙ্গীত মধ্যে সাত্বিক সঙ্গীত রাগ রাগিণী শুদ্ধরূপে গীত হইলে শ্রবণ সুখজনক হয়, আর ভক্তের অশ্রুবারি নিপতিত হয়। আর যে সকল সঙ্গীত আছে তাহাতে মনোরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির অশ্রুবারি নিপতিত হয় না। কবিবর তুলসিদাস এবং শ্রীজয়দেব এবং রাম-প্রসাদ সেন এই তিন মহাত্মা যাহা করিয়াছেন তাহাতেই অশ্রু বারিনিপতিত হয় ইহা সকলে জানেন। কিন্তু রামপ্রসাদী সঙ্গীত কেমন, যেমন গঙ্গার স্রোতঃবারি অবিরামে প্রবাহিত হইতেছে। প্রসাদী সঙ্গীতে ভক্তির স্রোত এতাদৃশ প্রবাহিত হইয়াছে যে ঐ গান পাঠ করিতে করিতে মোহ অন্ধতা দূরে যায় ভক্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়। হে ভক্তিভাজন মহাশয়! আপনাকে কি ধন্যবাদ দিব? এই বলিতে পারি, যেমন ভগীরথ গঙ্গা

আনিয়া জীব সকলকে মুক্ত করিয়াছেন, আপনিও সেই প্রকার রাম-প্রসাদী সঙ্গীত উদ্ধার করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। অতএব আপনাকে অসীম ধন্যবাদ দিতেছি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্য—

সংস্কৃত কলেজ। ১৪। ১০। ৭৮।

মহাশয়!

আমি আপনার প্রসাদ প্রসঙ্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করি য়াছি। আপনি বিজ্ঞাপনে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন প্রমাণ পাইয়াছি। তবে স্থানে স্থানে আপনার সহিত আমার মত ভেদ আছে, তাহা থাকুক কিন্তু আপনার সমালোচনা উৎকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই ইতি।

Baboo paresh Nath Mukharjie's Remark.

"This is, indeed, an addition to the Theological literature of the Hindoos."

পৃথিবীর সাহিত্যসংসারে পারমার্থিক কবিতায় রাম-প্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া গণনীয় করিতে

হইবে। কোন জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে সেরূপ রত্নরাজি বিরাজিত নাই। ডেবিডের ধর্ম্মগীতের সহিত তাহাদিগের তুলনা হয় না, কারণ ডেবিডের ধর্ম্মগীত সরল অন্তর হইতে সরলস্রোতে উৎসারিত হইয়াছে। হাফিজের পদাবলী এনাক্রিয়নের পদাবলীর ন্যায় বাহ্য বিলাসিতায় পরিপূর্ণ দেখায়। তাহাদিগের দ্বিভাব উচ্ছেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ম্যারাট হোরেসের পদাবলী অনুকরণ করিয়া যে গীতমালা বিরচণ করিয়াছেন তাহা তত গম্ভীর বোধ হয়না। তাহাতে যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্ব সম্পুর্ণ বিভিন্ন প্রকার; কারণ খৃষ্টধর্ম্মীয় গীতাবলীমাত্রেই ডেবিডের ভাব বিদ্যমান্ দেখা যায়। আমাদিগের বৈদিক গীতসমূহ অতি গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, ও পৃথিবীর আদিকালীন সরলতার নিদর্শন স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার পারমার্থিক সঙ্গীত প্রসাদী পদাবলীর সহিত তুলনীয় নহে। প্রসাদী পদাবলীর প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম্ম আর কোন প্রকার সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। রামপ্রসাদ সেন এক স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছেন ; কারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই আপনাপন নুতন পথ আবিষ্কার করিয়া লয়েন। তাঁহাদিগের হৃদয়ভাব ও চিন্তা এক নুতন পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নুতন ভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের কল্পনা নব নব

অলঙ্কার রাশি পরিধান করে, এবং নব ভাবে বিচরণ ও ক্রীড়া করিয়া সাহিত্য সংসারে শোভা সম্পাদন করে। রামপ্রসাদের কল্পনা এক অপূর্ব্ব পথে বিচরণ করিয়াছে। নূতন পথে অপূর্ব্ব ভাবকুসুমে বিরাজিত হইয়া এক অপূর্ব্বভাবে সাহিত্যসংসারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। সে কল্পনার অপূর্ব্বতায় যে কেবল নবীনত্ব আছে এমন নহে, সেই নবীনত্বের সহিত এক অভূত পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যও পরিদৃষ্ট হয়। নবীন অথচ মনোহর।

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজস্বিনী ছিল। তাঁহার কল্পনা এত তেজস্বিনী, যে সে কল্পনার বিভায়, তদীয় পারমার্থিক ভাব ও বিদ্যা, হীনপ্রভ হইয়াছে। তাঁহার পদাবলী সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু সেইভাব এত কল্পনার অলঙ্কারে পরিভূষিত, যে পরমার্থের সুন্দর রূপ ও লাবণ্য অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। তাঁহার পদাবলী অনেকস্থলে শাস্ত্রীয় বিদ্যায় পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু কল্পনা সে বিদ্যাকে এত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যে বিদ্যার গভীর জ্যোতি কিছুই পরিদৃষ্ঠ হয় না। রামপ্রসাদের কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই; দেখে নাই কোথায় কুসুমিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা ও মনোহর শস্যক্ষেত্র। সে কল্পনা

সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া একটী মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাঁহার কল্পনাকে অমনি আকৃষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদের কল্পনা যেন নিয়তিই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশিকেও স্থবর্ণে মিশ্রিত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতেই যে কেবল আপন হৃদয়ের সাত্বিকভাব আরোপিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহাকে প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এতদূর কবিত্বে পরিপূর্ণ যে বরং তাঁহার আরোপিত সাত্বিভাব কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিকে যথাযথ বর্ণন অথবা চিত্রিত করা কবির কার্য্য নহে। প্রকৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায়, তাহাই যদি বিকশিত করা কবিত্বের ধর্ম্ম হয়, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব নাই। রামপ্রসাদের হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাঁহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাঁহার হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্ম্মভাব প্রতিফলিত হইত; তৎপরে কল্পনার উজ্জ্বল অলঙ্কারে তাহা বিভুষিত হইত। যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রাদ বাস করিতেন, তাহার

চারিদিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাত্বিক ভাবের কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি কণকভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। দুঃখময়ী পার্থিব জগতীকে তিনি সুখময় অমৃত নিকেতন-রূপে প্রতীয়মান করিয়াছিলেন। কঠিন মৃত্তিকামায় জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীতধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল; বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় সামান্য পদার্থকে ধর্ম্মগীত সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্য পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইতে থাকি। * *।

প্রসাদ প্রসঙ্গকার যথার্থই বলিয়াছেন, যে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্ব ও কবিত্বের আমোঘ নিদর্শন। ইহাতে তাঁহার সাধকত্ব প্রতিপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব উজ্জ্বলতর বর্ণে প্রতিভাসিত দেখা যায়। এই সকল পদাবলী সঙ্গীত হইলে, আমরা প্রসাদের সাধকত্বে যত না বিমুগ্ধ হই, তাঁহার সুসঙ্গত উপমাচ্ছটায়, বাক্যরচনার ভঙ্গি

ও সরলতায়, রূপক রচনার চমৎকার ভাবে, আমরা ততোধিক বিমুগ্ধ হইয়া যাই।• এক এক সময়ে ভাবের প্রগাঢ়তা, প্রসাদ হৃদয়ের সমাধান, ধর্ম্মতৃষ্ণা, ধর্ম্মসাহস, বৈরাগ্য, ও মৃত্যুনির্ভিতি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ভাবি কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সেই সমস্ত ভাব প্রকটিত হইয়াছে। কত অল্প কথায় কত সুমহৎ ভাব, কেমন সরল ভাষায় তাহা প্রকাশিত, কেমন রূপক ও উপমালঙ্কারে তাহা সুসজ্জিত! তখন তাঁহার কবিত্বের অধিকতর প্রশংসা করিতে থাকি। ধর্ম্মসঙ্গীতের ইহা একটী ত্রুটি বটে, কিন্তু কবিত্বের ইহা প্রশংসা। আমাদিগের নিকট এই সমস্ত গীতে, কবির বিশেষ পরিচয় দেয়। কবি আমাদিগের মনে নূতন নূতন কল্পনার উদয় করিয়া দেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত ভুলিয়া গিয়া এই কল্পনার সঙ্গতি ও সামান্যতার মহত্ত্ব ভাবিতে থাকি। তাঁহার কল্পনার ঔজ্জ্বল্য নাই বটে, কিন্তু সে কল্পনার কৌশল ও সৃষ্টি বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তাঁহার উপমাচ্ছটায় আমরা যত না আনন্দ লাভ করি, তদপেক্ষা অধিকতর চমকিত হইয়া যাই। চমকিত হইলে যে আনন্দ, তাহাতে সেই আনন্দ। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের কৌশল যতদূর ভাবি, চিত্রের সৌন্দর্য্য ততদূর উপলব্ধি করি না। রামপ্রসাদ আমাদিগের মনকে যতদূর আকৃষ্ট করেন, হৃদয়কে ততদূর উদ্বোধিত করিতে পারে না।**।

রামপ্রসাদের সংগীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতিনির্ভয়ভাব—সুন্দর, সরল অথচ সৎসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা, ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায়না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সকল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্ব্বল প্রকাশিত হইতেছে। রামপ্রসাদের তেজ, ধর্ম্মের এবং সাধুজীবনের বলদর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয় যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজয় করিয়াছেন! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক রামপ্রসাদের বাক্‌ভঙ্গি অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ ভঙ্গি দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি, সাধন বলে এবং সাধুজীবনের সৎসাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্তান যেমন জনক জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলগর্ব্বিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বলদর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীত গুলি এই প্রকার ধর্ম্মসাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময় আমরা যেন তদ্রূপ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয়জ্ঞান হয়, এবং দেবভাব অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশুভাবকে প্রতাড়িত

করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সন্তান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি ? দেব-অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে মনে আর একবার আমরা শ্যামাপুজা করি, ধর্ম্ম অথবা শক্তির উপাসক হই। রামপ্রসাদের হৃদয়ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাঁহার হৃদয় অমনি আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীকে দেবভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। তাঁহাতে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি। তাঁহাতে মানবীয় দেবভাব দেখি। তাঁহাতে ধর্ম্মের জয় দেখি, তাঁহাতে স্ত্রীজাতির ভক্তিভাবের প্রাবল্য দেখি। শান্তশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভুত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবল, তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপবৈরিগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। যাহার ধর্ম্মশক্তি আছে,—সম্পদ, শান্তি ও সুখ তাহার পদতলে; একবার এই ভাবে প্রমত্ত হই। রামপ্রসাদের মত আমরারাও ত্রিভুবন জয় করি। ইহা কি দেবপূজা না ভক্তি ও ধর্ম্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়া ?

যে প্রসাদী গীতে এতদূর শক্তি, সে প্রসাদী গীত কি বঙ্গ-

বাসী সকলেরই আদরণীয় নহে ? সকলের গৃহে সেই প্রসাদী গীতের এক একখানি গ্রন্থ রাখা কি উচিত নহে? বঙ্গভাষা সে গীত কি কখন ভুলিবে ? যে গীতের তুল্যগীত কোন ভাষায় নাই, বঙ্গভাষ কি সে গীতসংগ্রহের জন্য যত্নশীলা হইবে না ? সেই মহার্ঘ রত্ন পরিধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না ? তবে আর বঙ্গভাষা কি ভূষণে ভূষিতা হইবে ? তাহার শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাহাকে যে ভূষণদাম কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন, সন্তানের ভক্তি মাল্য বলিয়া সে হার যদি না পরিধান করেন, তবে বঙ্গভাষাকে কে আর শোভিত করিতে চাহিবে ? বঙ্গভাষার এখন উচিত এই হার সযত্নে ধারণ করেন, ইহাকে আপনার রত্নভাণ্ডারে স্থান দান করেন, এবং ইহাকে সুবর্ণকোষে পরিস্থাপন করেন। ** ।

আমাদিগের সঙ্গীত সংগ্রহকার রামপ্রসাদ সেনের বিশেষ অনুরাগী। তিনি সেই সঙ্গীতের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের রসাস্বাদনে মোহিত হইয়া তিনি তিন বৎসর কাল বহু ক্লেশে স্বীকার করিয়া রামপ্রসাদ সেনের অনেক গুলি গীত সমুদ্ধার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বঙ্গসমাজের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। সেই ভূমিকায় তিনি রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীতের রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেনকে যাঁহাদিগের তত ভাল না লাগে, তাঁহারা একবার এই ভূমিকাটি পাঠ করি-বেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে সকল তর্কের কল্পনা হওয়া আব-

শ্যক, এই ভূমিকার মধ্যে এরূপ অনেক তর্কের বিষয় আছে; এই সমস্ত তর্কের বিষয় হইতে আমাদিগের অনেক আশাও আছে। ভূমিকালেখক রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীত গুলির ভাব ও কবিত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতি সুসঙ্গত ও চিন্তাপূর্ণ। বাস্তবিক তাঁহার ভূমিকাটি গ্রন্থের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, এবং জনসাধারণ তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থ খানির সমাদর করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা ও একান্ত প্রার্থনা।———আর্য্যদর্শন।

প্রসাদ প্রসঙ্গ—এই পুস্তক খানি আমরা অতিশয় ঔৎসুক্য ও আনন্দ সহ কারে গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। এত ঔৎসুক্য ও আনন্দের কারণ এই, গ্রন্থ সংগ্রাহক যেমন বলিয়াছেন "আমি প্রসাদকে বড় ভালবাসি ও ভক্তি করি। ভালবাসি তিনি কবি; ভক্তি করি, তিনি সাধক। বঙ্গদেশে একাধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব এই দুই দিব্য বস্তু অতি বিরল।" আমাদিগেরও অবিকল সেইভাব, তবে আমরা বলি একধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব কেবল বঙ্গ দেশে নয়, পৃথিবীতেও বিরল। গ্রন্থকারক তিন বৎসর অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া যে এই সুভাব সঙ্গীত গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য জনসমাজের একজন উপকারী বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তিনি রামপ্রসাদের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করি-

য়াছেন, তদ্দ্বারাও একটী অভাব কতক অংশে পূর্ণ হইয়াছে। রামপ্রসাদের সাধকত্ব ও কবিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সমীচীন উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছন এবং তাহার অধিকাংশ স্থলে তাঁহার সুরুচি, ভাবুকতা ও গুণ গ্রহণক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন ॥ ** গ্রন্থ প্রকাশক যে ৩৪ পৃষ্ঠা ভূমিকা লিখিয়া রাম প্রসাদের কবিত্ব ও সাধকত্বের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকরিলে পাঠকগণ অনল্প উপকার ও আনন্দ লাভ করিবেন এবং গ্রন্থকারকের চিন্তাপ্রণালী বুঝিতে পারিবেন।

* তিনি যাহা করিয়াছন, তজ্জন্য আমাদিগের সমুদায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুণ। অবলম্বিত ব্রতে চেষ্টাপর থাকিলে পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে সাধারণের অধিকতর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।—ভারত সংস্কারক।

বাহুল্যভয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের গাথকাদি মহাশয়-গণের পত্র, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজারপত্রিকা, এডুকেসন গেজেট সাপ্তাহিকসমাচার, সুলভসমাচার, মিরার, পেট্রিয়ট, ন্যাশনেল পেপার, বঙ্গবন্ধু, ঢাকাপ্রকাশ, হিন্দুহিতৈষিণী, বাঙ্গালী প্রভৃতি বহুসংখ্যক পত্র ও পত্রিকার সমালোচনা গৃহিত হইল না।

প্রথম খণ্ড।

অর্থাৎ

ঔপক্রমণিক, আনুক্রমণিক ও জীবনাখ্যায়িক

বিভাগ।

উপক্রমণিকা।

আমি প্রসাদকে বড় ভাল বাসি ও ভক্তি করি। ভাল বাসি,—তিনিকবি ; ভক্তিকরি,—তিনি সাধক। বঙ্গদেশে একাধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব এই দুই দিব্য বস্তু অতি বিরল। কেবল কবিরঞ্জনের মধ্যেই এই দ্বিবিধ গুণের যুগপৎ আবির্ভাব দেখিতে হইবে—একথা, বোধ করি, অত্যুক্তি হইল না। সেই স্বর্গীয় গুণের স্বর্গীয় ব্যবহার এক মাত্র প্রসাদই করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব ও সাধকত্ব দর্শন করিবার জন্য দুই বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে না। একমাত্র প্রসাদী সঙ্গীতই উভয় গুণের অমোঘ নিদর্শন। তাঁহার সুকবিত্বপূর্ণ সঙ্গীতাবলীর দ্বারা সাধকত্ব সপ্রমাণ করিবার পুর্ব্বে, আমি তাঁহার সঙ্গীত কেন সংগ্রহ করিলাম, কি অবস্থায় সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলাম, এই সংগ্রহের জন্য কোন্ কোন্

সোপান পরম্পরায় কি কি সূত্র অবলম্বন করিয়া আরব্ধ কার্য্যের অপূর্ণ শেষে পঁহুছিলাম, ইত্যাদি জানিতে পাঠকের ঔৎসুক্য হইতে পারে। সংক্ষেপতঃ তৎসম্বন্ধে অগ্রেই কিছু বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবতরণ করিব।

যখন আমি এই কার্য্যে প্রথম হস্ত প্রদান করি, তদবধি তিন বৎসরেরও অধিককাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে কি জন্য এ কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি জন্মে, তদুত্তরে আমার আশৈশব কাব্য ও কবিত্বময় সঙ্গীতে নৈসর্গিক অনুরক্তি ভিন্ন আর কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কাব্য শব্দটীও যখন বুঝি নাই, তখনও কেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীদাসের মহাভারত অহোরাত্র পড়িতাম, কি জন্যই বা পড়ে-পাওয়া শ্লোকগুলি পত্রস্থ করিয়া কণ্ঠস্থ করিতাম, আজও তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই। প্রসাদী সঙ্গীত সংগ্রহের প্রারম্ভেও কেন করিতেছি বুঝিতে পারি নাই।

প্রথমতঃ স্বগ্রামস্থ স্ত্রী ও পুরুষদের নিকট হইতে অপভ্রংশতা জড়িত বিকলাঙ্গ চার পাঁচটী সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া অতি ক্ষুদ্র একখানা পুস্তকে লিখিয়া লইলাম। বাস্তবিক তখন আমার সঙ্গীত সংগ্রহের যতটুকু আশা ছিল, পুস্তকখানা ততটুকই প্রস্তুত করিয়াছিলাম। রামপ্রসাদের জীবন-চরিত, তাঁহার দ্বারা অভিব্যক্ত সঙ্গীতসার, যাহা পাই তাহাই সংগ্রহ করিব, এই ইচ্ছা প্রথম হইতেই ছিল। সুতরাং যেখানে যে শব্দটি, যে পদটি, যে গানটী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কালকবল-নিপীড়িত প্রসাদের যশোরত্ন যথাসম্ভব রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলাম। রামপ্রসাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালী-সাধক এই কথা জনশ্রুতিতে জানিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কোন্ কুলের অলঙ্কার ছিলেন, তাঁহার বাড়ী কোথায়, কি কার্য্যে কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, ইহার কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। তিন বৎসরের মধ্যে

এই পূর্ব্ব বাঙ্গালার ধনাঢ্য জমীদার হইতে নিরন্ন ভিক্ষুক এবং বিদ্যাভিমানী তর্কালঙ্কার বিদ্যাবাগীশ হইতে নিরক্ষর কৃষককে জিজ্ঞাসা করিয়া আমি রামপ্রসাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছুই জানিতে পারি নাই। কেহ বলিল তাঁহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়, কেহ বলিল পদ্মাপারে; কেহ বলিল তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কেহ বলিল বৈদ্য ছিলেন। কোথাও জানিলাম তিনি বিষয় কর্ম্ম মাত্রই করেন নাই, অন্যত্র জানিলাম তিনি মোক্তারি করিতেন। অধিকাংশ লোকেই কিছুই জানি না বলিয়া বিদায় দিল। অতি অল্প সংখ্যক লোকেই তাহাদের কল্পিত সংবাদ প্রদান করিল। অন্য সমুদায় অনৈক্য সত্ত্বেও তাঁহার সাধকত্ব বিষয়ে সকলেরই এক মত। প্রায় দুই বৎসরকাল এইরূপ কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘটনাক্রমে কলিকাতার জনৈক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের নিকট তিনটী নিশ্চিত কথা জানিলাম। সেই তিনটি কথা এই—প্রথম, রামপ্রসাদ এক

জন বৈদ্যকুল-সম্ভূত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক কবি। দ্বিতীয়, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি সাধক ছিলেন। তৃতীয়, তাঁহার বাড়ী হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে।" এই সময়ে আমার নিকট প্রায় পঞ্চাশটী সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছিল। অতঃপর যথা সময়ে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমার আনন্দের অবধি রহিল না। বঙ্গভাষায় সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সুলেখক দিগের জীবন চরিতের মধ্যে, আমার সেই চিরান্বেষিত প্রসাদের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ পূর্ণ ও আংশিক দশ, বারটি সঙ্গীত প্রাপ্ত হইলাম। এইক্ষণ ইহাও জানিলাম, "কবিরঞ্জনের কাব্য সংগ্রহ" নামক একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর অনুসন্ধানে "কবিরঞ্জনের কাব্য সংগ্রহ" বাহির করিয়া লইলাম। উক্ত কাব্য সংগ্রহে সমুদয়ে একনবতি সঙ্গীত সংগৃহীত

হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টে আমার অজ্ঞাতে আরব্ধ কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীতি জন্মিল, কিন্তু আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এবং আমার সংগৃহীত সঙ্গীতের সঙ্গে পাশাপাশি তুলনা করিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, আমার আরব্ধ কার্য্য অন্য দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই, কেবল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন সঙ্গীত প্রাপ্তি অপেক্ষাও যখন দেখিলাম "কাব্য সংগ্রহের" অপূর্ণ সঙ্গীত কয়েকটি পূর্ণাবয়ব পাইতে পারিয়াছি, তখনই আমার পরিশ্রম নিরর্থক হয় নাই বলিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। প্রথমে আমি রামপ্রসাদকে কবি বলিয়া জানি নাই, তাঁহার কাব্য সংগ্রহ, আমার কার্য্যও হয় নাই। তিনি কালী সাধক, সেই সাধনার সঙ্গীত সংগ্রহই আমার কার্য্য। ইহা দ্বারা প্রসাদের সঙ্গীত কাব্য নয়, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। তাঁহার সঙ্গীত কেমন কাব্য পরে বলিব।

রামপ্রসাদ যে বিষয়ে কাব্য লিখিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার কাব্য অতি অল্প সংখ্যক লোকেই পাঠ করিয়াছেন, তথাপি ভারতচন্দ্রের কাব্যে বঙ্গদেশকে এমন করিয়া রাখিয়াছে যে অনেকে "বিদ্যাসুন্দর" নাম শুনিয়াই রোমাঞ্চিত হন। আমার নিকট কবিরঞ্জনের কাব্য দেখিয়া "ইনি বিদ্যাসুন্দরও পড়েন!" এই বলিয়া আমার জনৈক বন্ধু কণ্টকিত-কায় ও চমকিতচিত্ত হইলেন!!! মলিনগর্ভা শুক্তি হইতে মৌক্তিক প্রাপ্তির ন্যায় বঙ্গভাষায় কবিত্ব দর্শন করিতে হইলে এসকল অশ্লীল কাব্য পড়িতেই হইবে, যদিও আমার এই মত, তথাপি পরমার্থ সাধনার সোপান স্বরূপ সুগভীর ভাবপূর্ণ প্রসাদী সঙ্গীত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকে ইহাও আমার একান্ত অভিলাষ ছিল। এই উদ্দেশে উক্ত কাব্য হইতে কেবল সঙ্গীত সকলই গ্রহণ করিলাম। সর্ব্বশেষ উপায়, সাধারণ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়া আরো কয়েকটী সঙ্গীত পাইতে পারিয়াছি। আর প্রসাদী সঙ্গীত পাওয়া যাইবে না একথা বলিতে পারি না। কিন্তু

এ যাত্রায় ইহার অধিক প্রাপ্ত হইলাম না। এসকল সঙ্গীত যেরূপ গ্রাম্যতা ও অশুদ্ধতা বিমিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংশোধন ভিন্ন জন-সাধারণে বিদিত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং যথাসাধ্য সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই সংশোধনে হয়ত কবিরঞ্জন যে শব্দ যে স্থানে সন্নি-বেশিত করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করি? উপায়া-ন্তর নাই। তবে, ইহা অবশ্যই বলিব যে আমি আমার মনগড়া সংশোধন একটীও করি নাই। এক একটী গান পাঁচ, সাত বা ততোঽধিক ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে একস্থান হইতে ধূয়াটী, অন্যস্থান হইতে পদটী, তৃতীয়স্থান হইতে ভণিতিটী সংগ্রহ করিয়া এক একটী সঙ্গীতকে সর্ব্বাবয়ব করিতে হইয়াছে। সকল স্থলে, অপ্রাপ্তি বিধায়, এরূপ কার্য্যেও কৃতকার্য্য হই নাই। ক্রমান্বয়ে তিন বৎসরেরও অধিককালের অনুসন্ধান এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ দ্বারা প্রসাদী সঙ্গীত ও

রচনা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতাটুকু জন্মিয়াছে, তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে বাক্যটী প্রসাদের বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই রাখিয়াছি, অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছি।

যে সকল সঙ্গীতের কোন কোন অংশ, বিশেষতঃ ভণিতিরপদ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই সে গুলি প্রসাদের কি না সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহার নিকট হইতে যে সঙ্গীতটী লওয়া গিয়াছে, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ "এটী প্রসাদী সঙ্গীত কি না?" জিজ্ঞাসা করিয়া, সাধ্যমত অনুসন্ধান করিয়া, এবং অনেকের ঐকমত্যে এক একটীকে গ্রহণ করিয়াছি। অনন্তর বিক্রমপুর বাসী এক্ষণকার শক্তি সেবক শ্রীযুক্ত রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যথাসম্ভব সন্দেহ দূর করিয়াছি।

এক্ষণ আর একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিব। পূর্ব্ববাঙ্গলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার

জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ 'দ্বিজ' ছিলেন। কিন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না ইহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। দ্বিজ শব্দের রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া মূল অর্থে কবিরঞ্জনকেও অবশ্য দ্বিজ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানবাত্মাকে, মুক্তির পূর্ব্বে দ্বিজ হইতে হইবে। মানবাত্মা সেই পর্য্যন্ত মৃত, যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরেতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া 'দ্বিজ' হয়। এই মূল অর্থে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই কোন কোন সঙ্গীতে দ্বিজ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন কি না ইহা একটী গুরুতর প্রশ্ন। আমার বোধ হয় তিনি 'এরূপ করেন নাই। কারণ যে সকল সঙ্গীতে দ্বিজ রামপ্রসাদ' নামে ভণিতি আছে, সে সকল অপেক্ষাকৃত অনেক লঘুভাবাত্মক। কিন্তু কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীত সকল অতীব গভীরভাবাত্মক। কেহ কেহ বলেন যে বৈদ্যের ও আংশিক উপনয়ন ও গায়ত্রীতে অধিকার আছে। কবিরঞ্জন তাহা হইতেই আপনাকে দ্বিজ বলিয়াছেন।

তরুণ যৌবনের ঔদ্ধত্যবশাৎ হয়ত প্রসাদ এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন। ইহা যদি সত্যই হয়, তবে এ সঙ্গীত গুলি যে অতি প্রাথমিক সঙ্গীত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু 'হয়ত' 'অথবা' 'কিম্বা' দ্বারা এসম্বন্ধে আমার মনের চরিতার্থতা কিছুতেই হইতেছে না।

এইক্ষণ পাঠকবর্গ এই এক প্রশ্ন করিতে পারেন যে আমার ঐরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও কবিরঞ্জনের সঙ্গীতাবলীর মধ্যে ঐ সকল সঙ্গীতকে স্থান দিলাম কেন। ইহার কারণ অনেক। প্রথম কারণ এই যে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতিযুক্ত সঙ্গীত পাওয়া গেল বটে, কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ বাস্তবিক একজন ছিলেন কি না? যদি ছিলেন, তাঁহার বাড়ী কোথা? তিনি কোন্ শতাব্দির লোক? কি করিয়াই বা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন? ইহার বিন্দু বিসর্গও জানা গেল না। দ্বিতীয়, 'কবিরঞ্জনের কাব্য সংগ্রহে' যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে তাহারও কোন কোনটি দ্বিজ

রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। এমন কি কবিরঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে যে কয়েকটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, সেই কয়েকটীই দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তৃতীয়, ঐ সকল সংগীতের সুর ও রচনার বিভিন্নতা অতি অল্প। কেবল দুই এক স্থলে ভাবের কিঞ্চিৎ গুরুতা ও লঘুতা দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে আর কারণ প্রদর্শন করিতে চাই না।

আমি এই গোল মীমাংসা করিবার জন্য যে কি করিব ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। অথচ যে পর্য্যন্ত দ্বিজ রামপ্রসাদের বিষয় বিশেষ রূপে জানা না যায় সে পর্য্যন্ত এই সঙ্গীতগুলি কবি রাম প্রসাদের নয় ইহাও বলিতে পারি না। কাযেই "দ্বিজ" ভণিতিযুক্ত সঙ্গীত সকলও গ্রহণ করাই উচিত বোধ হইল। যদি কেহ এই গোলের মীমাংসা করিতে সক্ষম হন, এবং দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দিতে পারেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সাদরে গ্রহণ করিব। এবং

বারান্তরে, প্রয়োজন হইলে, উভয়ের সংগীত ভিন্ন করিয়া মুদ্রিত করিব। অন্যথা এ সকল সংগীতও কবিরঞ্জনের সংগীতাবলীর অন্তর্গতই রহিল।

সেন রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে গোলের কথা বলিলাম। তদ্ভিন্ন জনশ্রুতি এরূপ যে, কত হরিপ্রসাদ, গরী প্রসাদও সংগীত রচনা করতঃ স্বনামে প্রচারিত হইলে সাধারণ্যে সাদরে গৃহীত হইবে না বলিয়া, রামপ্রসাদের নামের ভণিতি দিয়াছেন! এই কাণ্ড যদি সত্য হয়, তন্নিরাকরণের কোন উপায়ই নাই। এইরূপ হওয়ার সম্বন্ধে আমারও অবিশ্বাসের বড় হেতু নাই। কারণ নিম্নে দেখুন ঃ—

"কেবা বুকের, কেবা পিঠের, বদ্‌নিয়তিয়া কাণীর কাণী। কেহ সারা দিনে পায় না খাইতে, (হেদে গো করুণাময়ী) কেহ দুধে খায় সাঁচি চিনি।

কেহ শুতে তেতালাতে, পালঙ্গেতে মশৈর টানি। আমরা মরি পুড়ে পুড়ায়ে (হেদে গো করুণাময়ী) ভাঙ্গা ঘরে নাই কো ছানি।

কেহ পরে শাল দুশালা, কেহ পায় না ভাঙ্গা ছালা। অনুভাবে (হেদে গো করুণাময়ী) বুঝি তারা, তেলা মাথায় তেল ঢালনী॥" ! ! !

প্রসাদী সংগীত সংগ্রহ করিবার জন্য কত বিভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবিধ অবস্থাপন্ন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছে, কত কৌতুকাবহ গল্প এবং গানই শুনিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদা নৌকারোহণে ঢাকা চলিয়াছি, পথিমধ্যে কর্ণধার একটী সংগীত গান করিল। প্রসাদী সংগীত সংগ্রহের যত সুযোগ পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই অপরিহার্য্য বোধে, তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি রামপ্রসাদী মালসী জান? সে আমাকে প্রসাদী সংগীত বলিয়া যে গানটী শুনাইয়াছিল তাহাই উপরে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি! পাঠকের মন যদি আমার মনের মত হয়, একটুকু আমোদ পাইবেন। রামপ্রসাদ কোন কোন সংগীতে কালীকে কটূক্তি করিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণ

করিতে গিয়া নিরীহ ভদ্রলোকগণ কি সকল কাণ্ডই করিয়া তুলিয়াছেন, এই গানটী তাহারও অন্যতর প্রমাণ।

এক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রসাদী সংগীত গুলিকে তুলনায় বলিতে গেলে দুর্ভেদ্য প্রস্তরাবৃত দুর্গম রত্নখনি বলা যাইতে পারে। রত্ন সংগ্রহ করিতে গেলে যেমন কুটীল ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা পথে সহিষ্ণুতা সহকারে খনির নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে; প্রসাদের সংগীতাবলী হইতে সাধনার ফল-রত্ন গ্রহণ করিতে হইলে, ঠিক সেইরূপ সহিষ্ণুতা সহ কূটভাষা-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ময়লাবৃত মণি যেমন অলক্ষিতে অতিক্রান্ত হয়, প্রসাদী সংগীতে নিহীত রত্নরাজিও পাঠকগণের দ্বারা সেইরূপে অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। রত্ন চিনিয়া লইতে না পারিলে যেমন রত্নখনিকেও কেহ আদর করে না, প্রসাদী সংগীত-কাব্যও সেই জন্যই কোন কোন স্থলে অনাদৃত হয়। যে খনিতে কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই, তাহা হইতে রত্না-

ভাবে রিক্ত হস্তে প্রতিগমন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রসাদী-সংগীত-রত্ন-খনি সম্বন্ধে আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে ইহাতে বহুল রত্নরাশি বিরাজিত রহিয়াছে, কেবল চিনিয়া বাহির করিতে পারিলেই হয়। আমি এক একটী সংগীতকে কতবার পাঠ করিয়া, এক একটী কুটবাক্য সম্বন্ধে কত ঘণ্টা চিন্তা করিয়া, কয়েকটী টীকা করিয়াছি বলিতে পারি না। তথাপি যে কয়টী সংগীত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহারই অনেকটীর অনেকানেক শব্দ, বচন ও ভাবের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি নাই। প্রসাদী সংগীত সংগ্রহ এবং তন্মর্ম্মাবধারণ কার্য্যে একটী অতি আশ্চর্য্য বিষয় এই দেখা গেল যে, যতই কালগৌণ করি ততই সংগীত প্রাপ্ত হই; যতই বারম্বার প্রাপ্ত সংগীত সকল অভিনিবেশ পুর্ব্বক পাঠ করি, ততই অমূল্য রত্ন দেখিতে পাই। অতএব পাঠকবর্গের নিকট আমার এই এক আন্তরিক অনুরোধ যে একটু সহিষ্ণুতা সহ একবার 'প্রসাদ প্রসঙ্গ' আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া

দেখুন। পাঠক যদি সুগায়ক হন একবার গাইয়া দেখুন, অন্যথা সুগায়ক দ্বারা তান লয়ে গাওয়াইয়া শ্রবণ করুন, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে যে আপনাকে মোহিত হইতেই হইবে।

সাধকমাত্রেরই প্রকৃত কথা এক। সুতরাং রামপ্রসাদের সাধনালব্ধ সত্য বাক্য অন্যান্য সাধকের সঙ্গে মিলিবে সন্দেহ কি? হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে নানারূপ মুক্তির কথা আছে। * তন্মধ্যে নির্ব্বাণ মুক্তি একতর। রাম প্রসাদ নির্ব্বাণ মুক্তি মানিতেন না। যথা—'নির্ব্বাণে কি আছে ফল' ইত্যাদি। তথা একমাত্র ভক্তিকেই মুক্তির স্থির উপায় বলিয়াছেন। যথা—'সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় মন তার দাসী' (৬ সং)। তিনি বেদকেও অভ্রান্ত বলিতেন না; অন্য শাস্ত্রতো দূরের কথা। যথা 'বেদে দিলে চক্ষে ধুলা' (১১ সং)।

* সালোক্য, সামীপ্য, সাযোজ্য, নির্ব্বাণ, এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কথাই বিশেষ প্রচলিত।

'মন করো না সুখের আশা, যদি অভয় পদে লবে বাসা।' (১৬ সং)। ঈশ্বরের অভয় চরণে শরণ লইতে হইলে 'সুখ'—সাংসারিক সুখের আশা করিতে হইবে না। আশার দাস না হইলেও যদি সুখ সমৃদ্ধি হয় হউক। কিন্তু তাহার আশায় ঘূর্ণায়মান হইতে হইবে না। প্রসাদের জীবন ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি ধন মাত্রই চাহিতেন না, তথাপি এক ব্যক্তি ধন ধন, সুখ সুখ করিয়া পূর্ব্ব দিকের আরক্তিম সূর্য্যকে পশ্চিমে তদবস্থ দেখা পর্য্যন্ত কায়মনোপ্রাণে পরিশ্রম করিয়াও ধনাগমের যে উপায় করিতে না পারে, রামপ্রসাদের জন্য তাহা অযাচিতরূপে মিলিল। সুখ, সম্পদ আসিলে ঠেলিয়া দূর করাও তাঁহার মত ছিল না। তিনি একটী দানও অগ্রাহ্য করেন নাই। যোগী ব্যক্তি ভোগীও হইবে ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, স্থানান্তরে একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। (৯৯ সং)। কপট ভক্তিতে আশা পূর্ণ হইবে না অর্থাৎ মুক্তি মিলিবে

না। যথা "মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পূরা-ইবে আশা। লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাসা॥" (১৬ সং)।

রামপ্রসাদের অতি প্রথম ও জড়োপাসক অবস্থায় রচিত সঙ্গীত ভিন্ন অধিকাংশ সঙ্গীতেই আধ্যাত্মিক অভাব ঐহিক ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। সাধক ব্যক্তি স্বর্গীয় সুখে সুখী হইয়া সাংসারিক শত অসুখকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। রামপ্রসাদের ঐহিক অসুখেরও কোন কারণই দৃষ্ট হয় না। তথাপি তাঁহার বাক্যগুলির অর্থ সাংসারিক ভাবে করিয়া কেন অনেকে প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হন বুঝি না। কবিরঞ্জন যে সকল স্থানে ঐ ভাবে অভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, (১১৫, ১৭৫, সং) তদ্দৃষ্টে স্থূলদর্শী ব্যক্তি তাঁহাকে ঘোর সংসারী বলিতে পারেন। কিন্তু স্থানান্তরে "কাজ কি মা সামান্য ধনে" এবং "চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র" (১১১, ১৩২, সং) বাক্য দ্বয় দেখিয়া সাংসারিক ধন রত্নে তাঁহার কেমন ঔদাসিন্য ছিল, বুঝিতে

পারিবেন। তিনি কিরূপ সংসারী ছিলেন এ স্থলে তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার জীবনচরিতই সাক্ষ্য স্থলে দণ্ডায়মান আছে। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী পাঠ করিয়াও যিনি ঐরূপ অমূলক বাক্য প্রসাদের প্রতি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, তিনি তাঁহার বাক্যের ভাব উদ্ধার করিতে অক্ষম। আবার ইহাও বক্তব্য যে রাম প্রসাদ মনুষ্য কে বুঝাইতে ব্যস্ত ছিলেন না, মনুষ্য হইতে প্রতিদানে কিছু চাহিতেনও না। সাধনীয়া শক্তিকে আপন আধ্যাত্মিক দুঃখ দুর্দশা জ্ঞাপন করিতে সঙ্গীত রচনা করিতেন। সঙ্গীতের ভাষা কেমন হইল একবারও ভাবিতেন না, ভাবিবার সময় ছিল না, ভাবিবার আবশ্যকতাও ছিল না। প্রসাদী সঙ্গীতের ভাব মনুষ্য বুঝুক আর নাই বুঝুক, কালী তৎসমুদায়ই বুঝিয়াছেন। ঈশ্বর ভাব গ্রহণ করেন, ভাষা নয়। যথাঃ—

" মূর্খোবদতি বিষ্ণায়, ধীরোবদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥"

মুক্তি সম্বন্ধে রামপ্রসাদের কেমন অটল বিশ্বাস ছিল, তাহা 'কত মহা পাপী তরে গেল রামপ্রসাদ কি চোর' (১৯ সং) এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। ঈশ্বরেতে তাঁহার কিরূপ ভক্তি ছিল তাহা "আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্ম-ময়ীর জমিদারী" (১৩৫ সং) এই বাক্যে প্রকাশিত আছে।

পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ যে ঈশ্বর-ভোগের কথা কহিয়াছেন, এক্ষণকার সাধকগণ যে ভোগের কথা কহিতেছেন, রামপ্রসাদও সেই ঈশ্বরভোগের জন্যই 'মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, দুটার একটা ঘটাইব' (২২ সং) বলিতেছেন। কিন্তু হায়! ভাষার বিচার করিয়া অনেকে হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। রামপ্রসাদ অবতার মানিতেন না; যথা—"তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলেনা মরিলেনা" (২৪ সং)। তিনি পুনর্জ্জন্ম হইবে, স্বীকার করিতেন না।

জী - ২২৭
Acc 22026
২০।৯।২০০৬

যথাঃ—"দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে। তবু রব মার চরণে, আরতো ভবে জন্মিব না" (২৪ সং)। মৃত্যুর পরেও ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হবে, পাপ করিয়া ঈশ্বর বিরোধী হইতে হবে সত্য, কিন্তু তজ্জন্য ভবে জন্মিতে হইবে না। অন্যত্র বলিয়াছেনঃ— "গিয়াছি না যেতে আছি, আর কি পাবে ভবে ?" (১০৭ সং)। তৃতীয় স্থান, 'ইহ জন্ম পর জন্ম বহুজন্ম পরে। রামপ্রসাদ বলেন আর জন্ম হবে না জঠরে॥' (৩১ সং)। এই দূরন্বয় বাক্যের দ্বারা অনেকে প্রতারিত হইয়া থাকেন, এবং প্রসাদ পুনর্জ্জন্ম মানিতেন এরূপ প্রমাণ করিতে চাহেন। ইহার অন্বয় ও প্রকৃত অর্থ আমি এইরূপ করি।—ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম, ইত্যাদি 'পরে' অন্যে বলে। কিন্তু রামপ্রসাদ এ সম্বন্ধে কি বলেন ? রামপ্রসাদ বলে 'আর জন্ম হবে না জঠরে' ; কিন্তু ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রথমাবস্থায় তিনি পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন, কারণ কোন সঙ্গীতে ঐ ভাবের আভাসও পাওয়া যায়।

প্রসাদ বলিতেছেন ' যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।' (৩২ সং)। এস্থলে রজনী কি ? রজনী শূন্য দেশ কোনটী ? এবং সেই দেশের লোকটি কে ? পাঠক ! একবার ভাবিয়া দেখুন ! রামপ্রসাদের কথায় যদি অবিশ্বাস না করিতে হয়, তিনি পাপতিমির বিহীন, অনন্ত আলোকময় স্বর্গের পবিত্র ঈশ্বরকে পাইয়াছেন, ইহা কি না মানিয়া পারা যায় ?

ঈশ্বর কেমন ? এই প্রশ্নের উত্তর রামপ্রসাদ যেরূপ দিয়াছেন ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট উত্তর মনুষ্য আর কি দিতে পারে ? ' আত্মারামের আত্মাকালী' এবং 'তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন' ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া 'আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন' (৩৬ সং)। ইহাই অতি চমৎকার উত্তর। মনেরও অতীত ঈশ্বর বাক্যের বচনীয় হইবেন, ইহাও কি সম্ভব ? যদি কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর চায়, সাধক 'আমার প্রাণ

বুঝেছে মন বুঝে না' বলিতেই বাধ্য। তিনি ইহাও বলিবেন যদি তোমারও বুঝিবার ইচ্ছা থাকে, সাধনা কর, ঈশ্বর কেমন তোমারও প্রাণ বুঝিবে।

'কে জানে বিভু কেমন' ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রসাদের 'কে জানে কালী কেমন' সঙ্গীতের অবিকল নকল। পরস্পরে তুলনা করিয়া দেখিলাম, আসল ও নকলে যেরূপ বিভিন্নতা থাকে, ঠিক তাহাই আছে। সাধন সঙ্গীতের "ঐরূপ বড় ভাল বাসি" সঙ্গীত রাম প্রসাদের "তাই কালরূপ ভালবাসি" (১৪২ সং) সঙ্গীতের নকল। রামপ্রসাদ কিরূপ মৌলিক কবি, মৌলিক গাথক ও মৌলিক সাধক ছিলেন একটুকু অনুধাবনা করিলেই প্রতীত হইবে। রামপ্রসাদের কাব্য অগ্রে পাঠ করিয়া ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন ভারত কত স্থানে কবিরঞ্জনকে অবিকল নকল করিয়াছেন। তাঁহার স্বনামখ্যাত সুর—প্রসাদীসুরই তাঁহার মৌলিক গাথকতার

অবিনশ্বর সাক্ষী। এই প্রসাদীসুরে ব্রাহ্মসমাজে, খৃষ্টান সমাজে, মুসলমান সমাজে কত সঙ্গীতই রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। সাধন সঙ্গীত, গীতরত্ন মিরজা হোসেন আলীর কোন কোন সঙ্গীত তাহার নিদর্শন। রামপ্রসাদের সাধু হৃদয়ের ভাব লইয়া কত লোকই ভাবুক ও গাথক হইয়াছেন। দুই একটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। নকলের নকল করিতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, মৌলিকতারই নকল হইয়া থাকে।

রামপ্রসাদ পুণ্যসঞ্চায়ার্থে তীর্থ পর্য্যটনকে নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়াছেন। (৬, ৪১, ৫৩, ৬২, ১০২, ১১৮ সং)।

'প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি। আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে পদে গঙ্গা গয়া কাশী।' (৬৯ সং)। কিরূপ সামান্য বাক্যে কেমন অত্যাশ্চর্য্য ও উচ্চ ভাব বিকাশ! দেঁতো অর্থাৎ বহির্দ্দন্ত বা গজদন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। দেঁতো ব্যক্তি না হাসিলেও যেমন দন্ত স্বতঃই প্রকাশিত থাকে, ঠিক

সেইরূপ মনুষ্য ব্রহ্মনিরূপণ করুক আর নাই করুক, করিতে পারুক আর নাই পারুক, তিনি স্বতঃ-প্রকাশিত। পক্ষান্তরে ইহা বলিলেই হয় যে মনুষ্যের বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিবার নিতান্ত আয়োজনাভাব।

কবিরঞ্জন মৃত্যুকে কেমন তুচ্ছ মনে করিতেন, আপনার মুক্তির কথা কেমন স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বর উপলব্ধি কেমন জীবন্ত ভাবে করিয়াছিলেন। (৭৩—৮১ সং) সঙ্গীত পাঠ করিয়া দেখুন।

ঈশ্বর আপন হস্তে পাপীর হৃদয়ে লিখিলেন— 'আমি আছি' এই বাক্য এবং নিম্নস্থ রামপ্রসাদের বাক্য এক কিনা দেখুন। — 'সনদ আমার উরস পাটে, যেমনি সনদ তেম্‌নি টাটে, তাতে স্ব-অক্ষরে দস্তখৎ করেছেন দিগম্বরে' (৭৩ সং)।

রামপ্রসাদ প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। (৫৩, ৭৬, ৮০ সং)।

'লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া' (৮৩ সং)। কবিরঞ্জনের এই বাক্যে

অর্থাৎ তিনি লক্ষাবধি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, এই বাক্যে কেহ কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে না। কোন জীবনাখ্যায়ক ইহাকে অসম্ভব প্রমাণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ইহা প্রমাণিত না হইলেই বড় ক্ষতি হইল, এমন মনে করি না! তিনি লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ইহাও প্রমাণ করিতে চাই না; অন্যেরা যেমন 'বহু সংখ্যক' বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁহারা যে কারণে অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট তত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই। কারণ প্রত্যহ পাঁচটী সঙ্গীত রচনা করিলে ৫৪ বৎসর, ৯ মাস, ২০ দিবসে এক লক্ষ সঙ্গীত প্রস্তুত হয়। রামপ্রসাদ ৫৪ বৎসরের কম বাঁচিয়াছিলেন এবং অশীতি বৎসরেরও অধিক জীবিত না ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? আবার রামপ্রসাদের সাধনার এক দিবসকে অন্যের দুই দিবস ধরিতে হইবে। কারণ, তিনি অহোরাত্র শক্তির

ধ্যান ও মহিমা কীর্ত্তনে রত থাকিতেন। এমন কি, দিন অপেক্ষা রাত্রেই বিশেষ ভাবে সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। সঙ্গীত রচনা তাঁহার পক্ষে কেমন সহজ বিষয় ছিল, তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই জানা যাইবে। যে রামপ্রসাদ একটী কটু-বাক্য শুনিয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ দুইটী সঙ্গীতে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, যে রামপ্রসাদ 'কালী কেমন?' 'গঙ্গাবাসী হওনা কেন?' ইত্যাদি প্রশ্ন শুনিয়াই সঙ্গীতে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে রামপ্রসাদ রথযাত্রা, দোলযাত্রা, চড়ক পুজা প্রভৃতি যাহাই চক্ষুর সমক্ষে পড়িয়াছে, তাহারই অতি গম্ভীর ভাবপূর্ণ সুকবিত্বময় সঙ্গীতাবলি রচনা করিয়াছিলেন, যে রামপ্রসাদ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও কএকটী সঙ্গীতে শক্তিগুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যিনি উঠিতে বসিতে, যাইতে আসিতে, খাইতে শুইতে, কথায় কথায় সঙ্গীত রচনা করিতেন, সেই রামপ্রসাদ সারা জীবন অহর্নিশি সঙ্গীত সাধনা করিয়া লক্ষ সঙ্গীত

রচনা করিবেন অসম্ভব কি? তিনি এক শিব-রাত্রিতে, এক শ্যামাপূজার রাত্রে, প্রত্যেক অমানিশায় কত সঙ্গীত অনর্গল গাইয়া ফেলিতেন কে জানে? তিনি অগ্র পশ্চাৎ, ভাল মন্দ, উৎকর্ষাপকর্ষতার দিকে চাহিতেনই না। যখন যে ভাব হইত তাহারই এক একটী সঙ্গীত করিতেন। আবার যে অল্প কয়টী সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেই একবাক্য, একভাব, এক রূপ উপমা পাঁচ, সাত, দশ স্থলেও দেখা যায়। এমন বিভিন্ন সঙ্গীত আছে, যাহাকে অভিন্ন বলিয়া ভ্রম জন্মে। 'লাখ্ উকীল করেছি খাড়া' এই কথা তিনি অনুমানেই মাত্র বলিয়াছেন তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। কারণ যিনি কখনও সঙ্গীতকে পত্রস্থ করিতেন না, তাঁহার পক্ষে এরূপ নিশ্চয় সংখ্যা দেওয়া অসম্ভব।

সাধক মাত্রেই এই কথা বলেন এবং স্ব স্ব জীবনে সপ্রমাণিত করেন যে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে। প্রসাদ ও

তাহাই বলিতেছেনঃ—'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে।' (২৪ সং)।

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সাধক মাত্রেরই প্রচারিত সত্য এক, কেবল ভাষার ও প্রচারের প্রকার ভেদ। সাধকগণ প্রত্যাদেশ বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই বলা যাইতে পারে। যদি ক্বচিৎ হইয়াই থাকে তাহাতেই অতি আশ্চর্য্যের বিষয় কি? মনুষ্য অপূর্ণ, অনন্তকালই অপূর্ণ থাকিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে। যে মনুষ্য মনুষ্যের মুখে কথা শুনিয়াই দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট যথাশ্রুত বলিতে অক্ষম হয়, কখন নিজ মনোমত দুই কথা ছাড়িয়া দেয়, বা ধরিয়া লয়, অথবা ভুলিয়া যায়, সেই মনুষ্য অসীম-ক্ষমতাবান্ স্বর্গের ঈশ্বরের আদেশ মর্ত্ত্যের মনুষ্যের নিকট যথাশ্রুত প্রচার করিতে ভ্রমে পড়িবে বা অক্ষম হইবে, ইহা কি অসম্ভব না অস্বাভাবিক? আবার যাঁহারা প্রচারিত

সত্যে ভুল ধরিয়াছেন বা ধরিতেছেন, তাঁহারা যে ভুলে পড়েন নাই, প্রমাণ কি ? এ সকল শত গণ্ডগোল সত্ত্বেও প্রত্যাদেশ হয় সন্দেহ নাই। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে ঈশ্বর ভৌতিক স্বর-যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ভৌতিক ধ্বনিতে আদেশ করিবেন না। নিরাকার ঈশ্বর নিরাকার আত্মাতে অকর্ণশ্রুতব্য শব্দে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। রাম প্রসাদ বলিতেছেন 'শুনেছি শ্রীনাথেরবাণী' 'পাগল ব্যাটার কথায় মজে' 'বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী' 'শিব যদি হন সত্যবাদী,' (৬৫,৬৭ ১৭৬, ২২০ ২২৩ সং) এসকল হয় কল্পনা নতুবা প্রত্যাদেশ।

রামপ্রসাদ সাকার সাধনা হইতে নিরাকারে পৌঁছিয়াও কত উচ্চ সোপানারূঢ় হইয়াছিলেন, বিবিধ সঙ্গীতের দ্বারা আমি অদ্যাপি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, এইস্থলে ও সঙ্গীতের নিম্ন টীকায় যথা-সাধ্য প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণ কেবল ইহা বলিয়াই আক্ষেপ করিতে হয় যে যদি প্রথম হই-

তেই সাধনার স্রোতঃ প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইত, প্রসাদের ন্যায় প্রাকৃতিক ভক্তি-প্রবণ ও ধর্ম্মলিপ্সু আত্মা এই জীবনেই আরো কত উচ্চ সোপানারূঢ় হইতে পারিত কে জানে!

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কেমন স্বভাব-কবি ছিলেন এবং কেমন প্রাঞ্জল ও অপ্রাঞ্জল উভয়বিধ কবিতা রচনাপটু ছিলেন, সমর বিষয়ক সঙ্গীতে তাহা বিশেষ ব্যক্ত আছে। তদ্ভিন্ন আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত, কালীকীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রী, এবং শবসাধনা ও শিবসঙ্গীত দেখুন। ২১৫ সংখ্যক সঙ্গীত (গৌরচন্দ্রী) তান লয়ে সঙ্কীর্ত্তিত শ্রবণ করিলে, কবিত্বরস বিবর্জ্জিত কঠোর হৃদয়ও যে দ্রব হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রামপ্রসাদ সরল ভাষা বিরচনে সুপটু হইয়াও অপ্রাঞ্জল রচনা করিলেন কেন?—অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহা স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে যে প্রত্যেক ভাষারই আদিম অবস্থায় কবির জন্ম অধিক, এবং লিখক ও পাঠক কুট ভাষাকে ভাল

বাসেন। এমন কি যিনি যত কুট অর্থে শব্দ প্রয়োগ ও ভাব বিকাশ করিতে পারেন, তিনি ততই সুলেখক বলিয়া গণ্য হন। বঙ্গভাষার কবিগণকেও নিসর্গ বহির্ভূত হওয়া সম্ভব নহে। ভাষার তৎসাময়িক অনুৎকর্ষতাও ইহার এক কারণ। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, পাঠকের মনস্তুষ্টির জন্য কেহ কেহ সরল লিপি শক্তি-সম্পন্ন হইয়াও কুটীল ভাষার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণের প্রহেলিকা এবং রামপ্রাদের কাব্য ও সংঙ্গীতাবলী তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কবিরঞ্জন কিরূপ ভক্তির সহিত চিন্তা করিয়া উপাস্য দেবীর নামের কেমন গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন দেখুন ;——

"কলীকাল কুঞ্জর কেশরী কালীনাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্য ধাম॥
কাল কর পৃথক, চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ অসি বটে সেই॥" কালী কীর্ত্তন।

'কাল' শব্দের অন্ত্য বর্ণ 'ল'কারের উপর 'ী' দীর্ঘ ঈকার স্বরূপ অসি নিপতিত হইয়া

কালী নামে কাল ছেদন হয়। কি অপূর্ব্ব চিন্তাপূর্ণ ভাব!

অন্যত্রঃ—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল।
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণী।
তথাচ তোমাকে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু ধ্যান করে সব জীব।
কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার।
কিন্তু, যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার॥
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার।
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমন কর নির্ব্বাণ কে চায়?"কালী-কীর্ত্তন

এইস্থলে রামপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে যদিচ 'কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার' তথাপি 'বেদবাক্য নিরাকার'. এবং কেবল সেই নিরা-

কার 'ভজনে কৈবল্য' ইহাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নিরাকারের সাধনা সুকঠিন, ইহা কে অস্বীকার করিবে? সাধ্য বস্তু যত শ্রেষ্ঠ, সাধনা তার তত কঠিন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব উচ্চেরও উচ্চ যে ঈশ্বর, তাঁহার সাধনা কঠিন—মহা কঠিন হইবে, পক্ষান্তরে ছেলেখেলাবৎ সাকার সাধনা সহজ হইবে, ইহাও কি বলিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন আছে? অথবা সাকারের—জড়ের আবার সাধনা কি? জড় পদার্থ দৃষ্টিতে পড়িবা মাত্রই তাহার আকৃতি প্রকৃতি, বহির্জ্জগৎ-দর্শনেন্দ্রিয় বাহ্য-চক্ষু——জড়-চক্ষু দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তরে পরিগৃহীত হয়। তখনি বুঝা গেল বস্তুটা কি? যদি সাকার মূর্ত্তিরও সাধনা করিয়া সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে হইত, যে লিখনীতে লিখিতেছি, যে পুস্তক পড়িতেছি, ইহা বুঝিতেও সাধনা করিবার আবশ্যক হইত!! তবে যদি মত এই হয় যে, সাধনা নিরাকারেরই করিতে

হইবে, জড় পদার্থের দ্বারা ঐশ্বরিক ভাবকে উত্তেজিত করা মাত্র, তাহা হইলেও হস্ত-গঠিত কল্পিত মূর্ত্তির প্রয়োজন কি? জগতে কত কত কমনীয় ও রমণীয় পদার্থ রহিয়াছে। অজ্ঞানী মনুষ্য কঠোর নিরাকার সাধনায় আশু ফল না পাইয়া, অসহিষ্ণুতা বশতঃ কি জানি ধর্ম্ম-বন্ধন বিচ্যুত হইয়া পড়ে, কি জানি একেকালে নাস্তিক হইয়া দাঁড়ায়, এই ভয়ে নিরাকারের সাধক,জ্ঞানিগণই সাকারের কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ কার্য্য কিরূপ হইয়াছে তৎ-সম্বন্ধে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। যে উদ্দেশ্যে সাকার কল্পিত হইয়াছিল তাহা যে সংসিদ্ধ হয় নাই, বা হইতেছে না, এমন নহে; কারণ ইহার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ লোক কিছু না চাহিয়া, না পাইয়াও একটা না একটা ধর্ম্মবন্ধনে সংযত থাকিতেছে। ঠিক ভাবে সাকারের পূজার্চ্চনাদি করিলেও বিবেক প্রখর হয়, ভক্তি প্রগাঢ় হয়, প্রেম প্রবর্দ্ধিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চরম ফল

কি? যাহার জন্য এত আয়োজন হইল, জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সাধক দেখিতে পাইলেন তাঁহার সেই সাকার ঈশ্বরই যে নশ্বর। ইহার পূজা গ্রহণ করিবার ও মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং তিনি কল্পিত দেবতা নিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

এই সাকার ও বহুদেব-পূজা সম্বন্ধে ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ শক্তি-সেবক দেওয়ান রামদুলাল রায় এইরূপ বলিয়াছেনঃ—'বালক যেমন খেলা কালে, জনককে জননী বলে, তেমনি মোহেতে বলে, নানারূপে কর ধ্যান।"

এক ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্যত্রঃ—"এক ব্রহ্ম নাহি আর, কেন ভ্রান্ত বারম্বার, প্রকৃতি পুরুষে মন কেন কর ভেদ।"

স্থানান্তরেঃ—"জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী। যে তোমায় যেভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজি॥

মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফেরিঙ্গি যারা মা।
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়েদ কাজী॥

শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা।
সৌরী বলে তুমি সূর্য্য, বৈরাগী কয় রাধিকা জি ॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি ॥
শ্রীরাম দুলালে বলে, বাজী নয় এ জেন ফলে মন।
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি ॥"

রামপ্রসাদ গিরিজায়া-মুখে আপনার নিগূঢ় সাধনার ফল কেন বিবৃত করিয়াছেন দেখুনঃ—

রাণী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায়।
পুনঃ হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায় ॥
একথা বুঝাব আমি কারে!
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো!
আপন অঙ্গে যখন পরে গো আঁখি।
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি ॥
কি গুণে এগুণ জন্মিল অঙ্গে?
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো ॥
কাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে।
প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে ॥
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়।
দর্পণরে যে গুণ গো তা জনে কেমনে রয় ॥

স্ফটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা ॥
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন।
এ তোমার অঙ্গের গুণ নয়, শ্রীঅঙ্গের গুণ ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ গো সেই গুণে মিশাল ॥
তুমি উমা ছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ।
অগো রাণি! অমন আর কি দেখা যায় তার প্রসঙ্গ ॥*

কালীকীর্ত্তন।

সমর বিষয়ক সঙ্গীতগুলি আদিরসাত্মক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে আদিরসের ব্যভিচার কোথাও দৃষ্ট হইবে না। বাঙ্গলার প্রায়শঃ কাব্যেই আদিরসের ব্যভিচার দেখিয়া অনেকেই

* পরশমণি স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, এইটী প্রবাদ মাত্র নহে, গূঢ় সত্যে মূল রহিয়াছে। পরমাত্মা স্বরূপ স্ফটিক এবং জীবাত্মাস্বরূপ জবা পরস্পরে পরস্পরেতে কেমনে প্রতিভাত হয়, কেমনে একে অন্যেতে মিশে, সাধক ভিন্ন অন্যের বুঝিবার অধিকার নাই। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে আর জবা স্ফটিকে প্রতিভাত হয় না, এ অতি সহজ বোধ্য।

আদিরসের নাম শুনিলেই মুখ বাঁকা করিয়া থাকেন। তথাপি ইহা বলিতেই হইবে যে, এই স অন্যান্য রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কাব্যকার [illegible] করিয়াছেন। একবার [illegible] ন্মিবে, যে বস্তুটী যত শ্রেষ্ঠ, তাহার ব্যভিচারে তত জঘন্য পদার্থ জন্মে। খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ অতি শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, দুগ্ধ পঁচিলে যে দুর্গন্ধময় বস্তুর উৎপত্তি হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। নারী-আত্মা অতি শ্রেষ্ঠ-গুণ-সম্পন্ন, অথচ ইহার ব্যভি-চারে যে জঘন্য চরিত্রের উৎপত্তি হয়, পুরুষাত্মার কখনও সে দুর্দ্দশা ঘটে না। সেই নিয়মে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আদিরস-সাগরের ব্যভিচার-মন্থনে জঘন্য অশ্লীলতা স্বরূপ হলাহল উৎপত্তি হইয়া কাব্য-কাননকে বিষময় করিয়া ফেলিয়াছে।

শক্তি সাধকগণ কি ভাব হইতে শক্তির সমর বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু দেবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণনা কল্পিত

হইলেও বিষয়টী অমূলক নহে। ইহার মূল অতীব নিভৃত, স্থূল দৃষ্টির অতীত। দেবাসুরের যুদ্ধের কারণ অম মৃত পান করিয়া দেবতা অমরত্ব ...য়, অসুর পরিপন্থী হয়। তাহারা দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হয়। দেবতা জয়ী হন। পুরাণের প্রস্তাব এই

এইক্ষণ অমৃত, দেবতা, এবং অসুর এই তিনটী, কি যদি বাহির করিয়া লইতে পারি, দেখিতে পাইব যে অমৃতের জন্য সুরাসুরের যুদ্ধ, কেবল সত্য যুগে হইয়াছিল এমন নহে; ত্রেতা, দ্বাপর এবং এই ঘোর কলিতেও অনবরত এই যুদ্ধ চলিতেছে। অসুর পরাস্ত হইতেছে, দেবতা জয়ী হইতেছেন। আরো দেখিব যত কাল সৃষ্টি থাকিবে ...ক অসুর পরাজিত হইবেই হইবে, দেবতা অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করিবেই করিবে। আমি যাহাকে অমৃত, দেব, এবং অসুর বলিব তাহাতেই সকলে সায় দিবেন কি না জানি না। কেহ হয়তো

বলিবেন অমৃত কবি-কল্পনা, ইহার অস্তিত্বই নাই। দেব এবং অসুর সম্বন্ধেও অনেকের অনেক মত থাকিতে পারে। এ সম্বন্ধে আমি এইরূপ নির্দ্দেশ করি। শাস্ত্রে অমৃতকে স্বর্গীয় সামগ্রী বলিয়াছে আমিও তাহাই বলি। অমৃত পানেই অমর হ[illegible] যায় ইহাও স্বীকার করি। 'আনন্দরূপ-মমৃতম্' [illegible] বেদবাক্যে নির্দ্দেশিত অমৃতকেই [illegible] দেবভাবকে দেবতা এবং পশুভাব[illegible] ভাব বা দেবতা সেই অমৃত পা[illegible] চায়, পশুভাব বা অসুর প্রতিদ্ব[illegible] কিন্তু এক সময়ে অসুরের পরাভব [illegible] মনুষ্যাত্মা যে পর্য্যন্ত না সেই অমৃত পান ক[illegible], সে পর্য্যন্ত মর্ত্ত্য[illegible] অমৃত পান করিলেই অমরত্ব ও স্বর্গলাভ করে।

প্রসাদী সঙ্গীত কেমন কাব্য? 'কাব্য রসাত্মক বাক্য' কিন্তু নব রসের একত্র সমাবেশ কোন কাব্যেই প্রায় দেখা যায় না। প্রত্যেক কাব্যই

এক রস প্রধান। কবি সেই প্রধান রসের প্রতিই মনোনিবেশ করেন, সুতরাং অন্যান্য রস দুচারটী আনুষঙ্গিক থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। কবিরঞ্জনের কাব্য দ্বারাই ইহাঁর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রসাদী সঙ্গীত সেরূপ কাব্য নয়। কাযেই ইহাতে এক রসাধিপত্য নাই। নব রসের একত্র সমাবেশ যদি কোথাও দেখিতে হয়, প্রসাদী সঙ্গীতেই দেখিতে হইবে। এসকল কোন কবির জীবনের কোন বিশেষ অংশের বা কোন বিশেষ ভাবোত্তেজনার রচনা নয়। কবিত্ব কলিকার বিকাশ হইতে পুর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত যে কালে, যে স্থানে, যে অবস্থায়, যে ভাব হইয়াছে সঙ্গীত সকল সেই সেই রসেই অতর্কিত ভাবে রচিত হইয়াছে। এইরূপে রচিত কাব্যে নবরসের সমাবেশ না থাকিলে, আর কোথাও কি থাকা সম্ভব? হায়! প্রসাদের সঙ্গীতাবলীর এক চতুর্থাংশও যদি পাওয়া যাইত, প্রসাদী সঙ্গীতকাব্য যে কেমন কাব্য, সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারি-

তেন। কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহারই মর্ম্মাবধারণ করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করুন, দেখিবেন নব রসেই আপনাকে মোহিত করিবে।

এই সঙ্গীত কাব্যেও একটী রসের প্রাধান্য আছে। সেই রসের নাম বলিলে কে কি বলিবেন জানি না। কারণ প্রসাদী সঙ্গীত কাব্যকে আমি যে রস-প্রধান বলিব, শাস্ত্রকার রসশ্রেণীতে তাহাকে গ্রহণ করেন নাই। অশাস্ত্রোক্ত রসের প্রাধান্য স্বীকার যদি অন্যায় না হয়, আমি বলি প্রসাদী সঙ্গীত-কাব্য ভক্তিরস-প্রধান। কেহ হয়তো এই রসকে রস শব্দের বাচ্যই বলিবেন না, কেহ আবার ভক্তিকে নবরসের কোন এক বা ততোধিক রসের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিতে বলিবেন, কিন্তু তাহা হয় না। ভক্তি যে যে রসের মধ্যে থাকিতে পারে, তাহার নাম গন্ধও যেখানে নাই, সেই স্থানেও প্রসাদ-প্রসঙ্গ ভক্তি রস প্রধান রহিয়াছে।

প্রসাদী সঙ্গীত সংগ্রহ আরম্ভ করিবার সময় বুঝিতে পারি নাই, কেমন গুরুতর বিষয়ে হস্ত প্রদান করিয়াছিলাম। এইক্ষণ দেখিতেছি যে এত বড় উচ্চ কাজে হাত দেওয়া বড় অসম সাহসিকতার কার্য্য হইয়াছে। আমা অপেক্ষা সুযোগ্য হস্তে এই কার্য্য সম্পাদিত হইলে অনেক ভাল হইত।

আমার অনুসন্ধান এই হইতেই শেষ হইল না। প্রসাদী সঙ্গীতকে জনসাধারণ কি চক্ষে দেখেন, তাহা দেখিবার জন্য এবার এই পর্য্যন্ত শেষ করিলাম। অনুপযুক্ততার জন্য আমি সাধারণের নিকট যতই কেন লাঞ্ছিত হই না, তাহাতে আমার কিছুই দুঃখ হইবে না। কিন্তু আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কবিরঞ্জন যদি পাঠকের নিকট অনাদৃত হয়েন, আমার তাহাতেই মর্ম্মান্তিক ব্যথা জন্মাইবে।

প্রসাদ প্রসঙ্গের ভাবী সংস্করণের কারণ অনেকই রহিল। আরো সঙ্গীত পাওয়া যাইবে

না এমন নহে; এবার অনেক সঙ্গীত বিকলাঙ্গ রহিল; আজও অনেক পদের ও শব্দের মর্ম্মাবধারণ করিতে পারি নাই। কিন্তু ভাবী সংস্করণের প্রয়োজন হইবে কি না তাহাই প্রশ্নের বিষয়। যদি আবশ্যক হয়, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধ্য মত সম্পাদন করিতে কৃতসংকল্প রহিলাম।

অনুক্রমণিকা।

প্রসাদী-সঙ্গীতের ভাণ্ডার অক্ষয়, ইহা পূর্ব্ব বারেই বলিয়াছিলাম, যতই অনুসন্ধান করা যায় ততই এই সঙ্গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রসাদী সংগীত সংগ্রহ, প্রসাদ প্রসঙ্গের দুই এক সংস্করণে শেষ হওয়া দূরে থাকুক, কখনও শেষ হইবে কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক, এই অল্লাধিক এক বৎসর কাল মধ্যে আরও একষষ্টি নূতন সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি কোন কোন পুস্তক হইতে, কতকগুলি কোন কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট কতকগুলি কলিকাতার সঙ্গীতোপজীবী ব্রাহ্মণ হইতে ক্রয় করিয়া লওয়া গিয়াছে।

প্রসাদ প্রসঙ্গের প্রথম সংস্করণে সঙ্গীত সকলের রাগ রাগিণী ও তাল ঠিক করিয়া দেওয়া হয় নাই। প্রসাদী সুরে অধিকাংশ সঙ্গীত গীত

হইতে পারে ইহাই বলা হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গীতের উক্ত অভাব থাকাতে প্রসাদ প্রসঙ্গকে সঙ্গীত পুস্তক বলিয়াই বোধ হইত না। এই অভাব দূরীকরণার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ত্রিপুরা নিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র নন্দী মহাশয়কে আমার মনস্থ জ্ঞাপন করি। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

এই বারেও প্রসাদী সঙ্গীতের দুরূহ শব্দের অর্থ ও কুট শব্দ ও ভাবের টীকা এবং ব্যাখ্যা করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি; কিন্তু তথাপি অনেকানেক শব্দ ও ভাব অটীক এবং অব্যাখ্যাত রহিয়াছে।

যদিচ কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রাম-প্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রাম প্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় একজন

দ্বিজ রাম প্রসাদ ছিলেন—আমার এই সংস্কার দূর হইল না। "দ্বিজ রাম প্রসাদ" ভণিতি যুক্ত সঙ্গীতগুলি কবিরঞ্জনের সঙ্গীত মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় এ সকল সঙ্গীত দ্বারা কবিরঞ্জনের কিছুই পদবৃদ্ধি হইতেছে না, বরং কতক পরিমাণে পদহানি হই-তেছে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব অপ-রের ভাণ্ডারে ন্যস্ত হইতেছে! আবার দেখিতেছি ইহাও এক প্রকার প্রকৃতিরই গতি। সুতরাং যেমন অনেক হীণপ্রভ কালিদাস খরপ্রভ কালি-দাসে লীন হইয়াছেন; যেমন অনেক ভাঁড়, ভাঁড়-চূড়ামণি গোপাল ভাঁড়ে লীন হইয়াছেন, সেই রূপ এক অল্প-প্রাণ রামপ্রসাদ এক মহাপ্রাণ রাম-প্রসাদে লীন হইলেন।

মনে বড় বাসনা ছিল প্রসাদের বাসস্থান ও সাধনার পঞ্চমুণ্ডী আসন দেখিব। এই উদ্দেশ্যে দুই জন বন্ধু সহ হালিসহর গমন করি। তথায় প্রথমে কুমার হট্ট, তৎপরে তদন্তর্ব্বর্ত্তী

শিবের গলিতে অনুসন্ধান করিয়া জন মানবশূন্য জঙ্গলময় প্রসাদের আবাস ভূমিতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম প্রসাদের গৃহ-প্রাঙ্গনে পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। এমন স্থানে কেই বা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া দিবে এবং দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাইয়াদিবে? ঘটনাক্রমে এক বৃদ্ধ কুম্ভকার সহ সাক্ষাৎ হইল। সে বসে বসে একটী ভগ্ন প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ ইষ্টক উদ্ধার করিতে ছিল। তাহার নিকট বসিয়াই আমরা কতকগুলি ঔপন্যাসিক কথা শুনিলাম।

সে সর্ব্ব প্রথমে স্বর্ণের মহত্ব বর্ণন করিল। বলিল মহাশয়! এই যাহা দেখিতেছেন, একি আর সেই কুমারহট্ট? সংক্রামিক জ্বরে এই দেশ উৎসন্ন করিয়াছে। পূর্ব্বে এই কুমারহট্টে পাঁচ শত ঘর কুমার বাস করিত। এই গ্রামের নাম কুমারহট্ট কেন হইল তাহাও শুনুন। একদা এইস্থান অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী গুণীর বাসস্থান ছিল। তখন নবদ্বীপের

পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে এখানকার পণ্ডিত গণের সমকক্ষতা নিবন্ধন প্রায় পরস্পর তর্ক বিতর্ক এবং বিচার চলিত। এক সময়ে নবদ্বীপের কএকজন পণ্ডিত এখানে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন। কুমারহট্টের পণ্ডিতগণ চক্রান্ত করিয়া, তাঁহার সঙ্গে বিচার করিবেন না এই ঠিক করিয়া, একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুচতুর কুম্ভকারকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত করেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শজিনা ফলে দাল রন্ধন করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন। শজিনা ফলের এক এক খণ্ড একাধিক বার মুখে দিতে দেখিয়া সেই কুম্ভকার বলিল, ছি ছি আপনারা পণ্ডিত হইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। আপনাদের সঙ্গে আবার পণ্ডিতগণ কি বিচার করিবেন? এই সূত্র ধরিয়া সেই কুম্ভকারই তাঁহাদিগকে নিতান্ত অপদস্ত করে। এইরূপে কুম্ভকার হইতে পণ্ডিতগণ হটিয়া গেলেন বলিয়া স্থানের নাম কু-

মারহট্ট হইয়াছে। এই গল্প কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু হালিসহর যে এক সময় বাস্তবিক অতি সমুন্নত ও সম্পন্ন অবস্থায় ছিল তাহাতে কিছু সন্দেহ হয় না। ভগ্নোন্মুখ প্রাকার, ভূলুণ্ঠিত প্রাসাদ ও জীর্ণ শীর্ণ দেব মন্দিরাদি কুমার হট্টের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত কৃতান্তচর সংক্রামক জ্বর হালিসহরকে এক প্রকার জন শূন্য করিয়া গিয়াছে।

তদনন্তর উক্ত কুম্ভকারই আমাদিগকে প্রসাদের বাসস্থানের বিশেষ বিশেষ স্থান প্রদর্শন করিয়া দিল।

দেখিলাম তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী-সাধনাসন এক্ষণও একটী দোলমঞ্চের ন্যায় বিদ্যমান আছে; কিন্তু এরণ্ড, ভাণ্ডির প্রভৃতি দ্বারায় সমাচ্ছাদিত হইয়া বন্য পশুর আবাস ভূমি হইয়াছে। শুনিলাম ইতিপূর্ব্বে হিন্দু গায়ক মাত্রেই এই আসন সমীপে আসিয়া সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করতঃ আসনের ভূমি

মস্তকে ও জিহ্বাগ্রে প্রদান পূর্ব্বক আহূত স্থানে গান করিতে যাইত। শুনিলাম কোন কোন গায়ক একবার কোন স্থানে পরাজিত হইয়া এই আসন সমীপে হত্যা দিয়া পরে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ত্রয়োদশ বঙ্গারে ঘোর ধর্ম্ম প্লাবন সময়েও এতাদৃশ হীনাবস্থাপন্ন প্রসাদের সাধনাসন সমীপে কেহই মল মূত্র ত্যাগ করিতে সাহসী হয় না। অনেকে এই সকলকে কুসংস্কার বলিবেন, আর যাহারা এই রূপ করে, তাহাদের কুসংস্কার আছে সত্য; কিন্তু সাধকবর কবিরঞ্জনের সিদ্ধির আসনকে ইহা অপেক্ষা অধিক সম্মান করা আমার উচিত বোধ হয়। বদরিকাশ্রমস্থ ব্যাসাসন, হিমাচল কুঠরস্থ বশিষ্ঠাসন, চিত্রকুটস্থ ভরদ্বাজাসন যেরূপ পুণ্যভূমি, কুমারহট্টের প্রসাদাসনকেও তদপেক্ষা কোন অংশে হীন মনে করা উচিত নয়।

কিন্তু হায়! আমরা কিরূপ স্বদেশ ও স্বজাতি বিমুখ জাতি! আমরা স্বার্থসাধনে, স্বনামের ধ্বজা

উড্ডীয়নে ও পরাজিত পদলেহনে কিরূপ তৎপর! হায়! বঙ্গদেশের নগরে নগরে বঙ্গের ধনে কত বিদেশীয় প্রতিমূর্ত্তি, বিজাতীয় নামের ভজনালয়, বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে; আর বাঙ্গালীর শিরো-রত্ন স্বরূপ রামমোহন রায়ের সমাধিস্থানে পরদত্ত একটী ক্ষুদ্র মন্দির ব্রিষ্টল নগরে স্থাপিত হইল!! দুষ্ট, দুশ্চরিত্র ও ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির নাম সমুচ্চা-রিত হইতে না হইতেই সহস্র সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়া তন্নামে প্রসাদ প্রতিষ্ঠিত হইল, আর এতকাল মধ্যে "প্রসাদ প্রাসাদ" বা "রাম মোহনালয়ের" নাম একবারও বাঙ্গালীর মুখে আসিল না!! কেনই আসিবে? প্রসাদ-প্রাসাদ বা রামমোহনালয় সংস্থাপনার্থে অর্থদান করিলে লাভ কি? তাহাতে আমার নামে 'ক' অক্ষর টাও সংযুক্ত হইবে না। রামপ্রসাদ বা রাম মোহন সমাধিসমুত্থিত হইয়া তো আমাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিবেন না। তবে অর্থ দিব কেন?

জানিনা বঙ্গের এই দুর্ম্মতি ও দুর্দ্দশা কবে ঘুচিবে। জানিনা বাঙ্গালী কবে স্বদেশ ও স্বজাতির সম্মান করিতে শিখিবে। জানিনা কবে প্রসাদের আসনোপরে প্রসাদ-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কবিতা।

প্রসাদ! প্রসাদগুণ * করি সংবরণ।
পলালি কোথায়? কালী-ভক্ত-বিনোদন!!
হে কবিরঞ্জন! "বরপুত্র কালীকার"।
কাল-সুত, তবু হলি কাল অধিকার!!

---

* প্রসাদগুণ—প্রাঞ্জলতা। প্রসাদের রচনায় প্রসাদ-গুণের অভাব নাই। কিন্তু অপ্রাঞ্জল রচনাও যথেষ্ট আছে। এখানে "প্রসাদগুণ" দুই অর্থে ব্যবহার করা গিয়াছে। যে সকল কবিতা প্রসাদগুণ সম্পন্ন সেই স্থলে গুণ-পরিচ্ছদের প্রসাদগুণ তদ্বিপরীত স্থানে প্রসাদের নিজগুণ—যাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেনঃ—

"কালী কিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদে যার॥"—কালী কীনর্ত্ত

হারে কাল! তোর কি রে নাই কালাকাল?
কবিকে কবলে আরো করিস সকাল॥
সুধীবর সাধু কবি, শ্রীকবিরঞ্জন।
নিদয় হৃদয়! তাঁর করিলি হরণ!!
দ্রবয়ে পাষাণ যাঁর ললিত সঙ্গীত।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ গায় যাঁর গীত॥
যাঁহার সঙ্গীত আজো প্রতিদিন ক্ষণে।
জীবিকা যোগায় দীনহীন জনগণে॥
যাঁর মুখে শুনে সে মধুর লয় তান।
বিগলিত ক্রূরকর্ম্মা সিরাজের প্রাণ॥
রচিলা সঙ্গীত যিনি কথায় কথায়।
যাহা চাও তাহারি উত্তর কবিতায়॥
কবি-মনোবিমোহন যাঁহার রচন।
অযাচিত রাজোপাধি শ্রীকবিরঞ্জন॥
যাঁর নামে সুর * আছে ভারত মাঝার!
হায়রে জীবনী তাঁর খুঁজে মেলা ভার।
বঙ্গীয় কবির এত—এত অল্প মান।
কবিরঞ্জনের হায়! কে লয় সন্ধান॥

রামপ্রসাদী সুর।

অন্য জনপদে যদি জন্মিত প্রসাদ।
শুনিতাম কত যশোবাদ সাধুবাদ ॥
হ'ত কত তাঁহার কাব্যের সমাদর।
সোনালী রঙ্গীণ বই বাঁধান সুন্দর ॥
অশ্লীল হইত শ্লীল পরভাসা সাজে।
হইত উদ্ধৃত কত পাঠ্য বই মাঝে ॥
থাকিত কবির ছবি, কাব্যের সম্মুখে।
বিস্তার জীবনী পড়িতাম মন সুখে ॥
হত বিধি বঙ্গেতে প্রসাদে জন্ম দিলে।
ন্যায্য যশোভাগ যথা সহজে না মিলে ॥
তাই জন্ম-মৃত্যু-শক, মাস, দিন বার।
প্রভূত প্রয়াস সত্তে মিলিল না আর ॥
কি দুখ! কি লাজ! মরি এমন কবির।
তনয়ে জনক কেহ করিয়াছে স্থির * ॥
কোথায় জনম, কোথা শৈশব হরণ।
কোথায় কেমনে কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন ॥

* কোন জীবনাখ্যায়ক এমন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে রামপ্রসাদের পুত্র রামদুলাল সেনকে অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহার পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন!!!

জীবনের কোন্ অংশে বিয়োগ পিতার।
কখন কি ভাবে নিলা সংসারের ভার॥
কবিত্ব-কমল-কলি ফুটিল কখন।
স্থির নিদর্শন মরি! আছে কি এমন!!

হায়!—কাটিল জীবন সূত্র কাল-খর ধারে।
ভাসিল জীবনী-তরী কাল-পারাবারে॥
অনন্ত কুটিলা গতি কালের এমন।
অলক্ষিতে লয়ে চলে যা পায় যখন॥
কালের তরঙ্গ তুঙ্গ গভীর গর্জ্জনে।
ভাবী হতে ভূতসিন্ধু পড়িছে সঘনে॥
বর্ত্তমান কালের অস্তিত্ব কোথা আর।
দেখিতে দেখিতে ভাবী ভূতের মাঝার॥
ভাবী-সিন্ধু-ভীম-বীচি ভীষণ নিস্বনে।
বজ্র বিচূর্ণিত করে প্রচণ্ড চাপনে॥
এ তরঙ্গ সঙ্গে তরী ভাসিয়া চলিল।
ইতস্ততঃ সঞ্চালিত সচল সলিল॥
রত্নগর্ভা সে জীবনী তরণী রক্ষণ।
করিতে তখন নাহি ছিল এক জন॥
একে একে নাশ হলো গর্ভের রতন॥

দৃষ্টির অতীত পথে হইল গোপন॥

জাতি-স্বত্ব রক্ষা তরে সুকবি ঈশ্বর।
প্রেরিলা সন্ধান দূত বহু অতঃপর॥
পরিশ্রমে শিরোঘাম পশিল চরণ।
তবেতো পাইলা গুপ্ত ধনে গুপ্ত ধন॥
'কবিরাজ হয়ে তিনি হন কবিরাজ।'
প্রসাদ অগ্রজ কবিরাজ-কবিরাজ॥
কবি ভিন্ন কে করিবে কবির সম্মান।
অরসিক রস কথা শুনে ঢাকে কাণ॥
সামীপ্যে কি হয় সামগ্রীর সমাদর।
পরে কি প্রসূন-হার শাখার বানর?
কাব্য সুধা কবি ভোগ্য অন্য যোগ্য নয়।
শ্রীফল সুফল কাক কখন কি কয়?
কবি তেঁই কাব্য, আর জীবনী সংগ্রহ
প্রকাশিলা প্রভাকর-কর অহরহঃ॥
প্রকাশিলা, কিন্তু কাল-ক্ষতি সুপ্রচুর।
হইলনা—হইবেকি? হায় আর দূর॥
পুনঃ—যখন করাল কাল-ঘোর প্রভঞ্জন।
প্রহারে জীবন তরু হয় উন্মূলন॥
জীবন-বিটপীরুহা জীবনী বল্লরী।
বাহন-বিচ্যুতা হয়ে গেল গড়া গড়ি॥

তথা কাল চক্রের সঘন আবর্ত্তন।
নিপীড়িল সমূলে সে লতিকা জীবন ॥
তাকেও প্রবল ঝঞ্ঝা পাখশাঠ বলে।
উড়ায়ে ফেলিল লয়ে বিস্মৃতির জলে ॥
বহমান স্রোতঃ সহ ব্রততী চলিল।
হায় তাকে দেখিয়াও কেহ না ধরিল।
শতাধিক বর্ষ পথে লইল যখন।
ঈশ্বর ধরিলা কর করি প্রসারণ ॥
রোপিলা জীবনী-বল্লী যত্ন-জল দিলা।
প্রভাকর খরকরে পুনর্জ্জীব নিলা।
বাঁচিল জীবনী, কিন্তু ভীষণ প্রহারে।
কত স্থান ছিন্ন ভিন্ন হায়! একেবারে ॥
কাল ক্ষয়-কলঙ্ক রয়েছে বহুতর।
রহিয়াছে—যাইবে কি?—তাহার উপর ॥
ছিন্ন মূল, ছিন্ন ফুল, শীর্ণ কলেবর।
দেখে সে জীবনী কার না পোড়ে অন্তর।
যশোরত্ন ছিল সেই স্বর্ণ লতিকায়।
প্রভঞ্জন প্রতিঘাতে ছড়ে পড়ে যায় ॥
রতনে যতন করে কেহ না তুলিল।
তুলিবে কি? ছিল কি না? তাহাও ভুলিল ॥

এইতো রে পোড়া পৃথিবীর আচরণ।
গুণীকে জীবনে কেহ মানে না কখন ॥
তা হলে, হোমার কি রে জীবিকার তরে।
কবিতা গাইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে ॥
যাঁহার জনম স্থান বলে সপ্তগ্রাম।
এখন নিয়ত পরস্পরেতে সংগ্রাম ॥
তবে কি মিল্‌টন "পেরেডাজ লষ্ট" তাঁর।
অনাদৃত দেখি, মরি! কবিত্ব ভাণ্ডার ॥
তুচ্ছ শত টাকা পেয়ে স্বত্ব করে দান।
যে বই বিক্রয় করে ধনী টম্‌ সান্‌ ॥
তা হলে কি কালিদাস ফুলমালা তরে।
কবিতা মালা কুসুম-মালা বিনিময় করে?
তা হলে প্রসাদী-গীতি কাব্য সুধাময়।
একে একে পাইতে কি পারিতো রে লয় ॥
তবে কি সাধক কবি প্রসাদ প্রসঙ্গ।
হেলায় হারায়ে আজ বিলাপে এ বঙ্গ ॥

সাধকবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন চরিত।

সম্ভবতঃ ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে, সুপ্রসিদ্ধ হালিসহর পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমারহট্ট * গ্রামে বৈদ্যকুলভূষণ "কবিরঞ্জন" রামপ্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন।

রামপ্রসাদের বংশাবলী সম্বন্ধে নানারূপ গণ্ডগোল হইয়াছে। তন্নিবারণ পক্ষে তাঁহার নিজ বাক্য যতদূর বিশদ, অন্য কিছুই সেরূপ নহে। অতএব তাঁহার প্রধান কাব্য "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের" স্থানে স্থানে, তিনি যে আপনার পূর্ব্ব-

---

* কুমারহট্ট—সাধারণতঃ কুমারহাটা। জানা গেল যে পূর্ব্বে এস্থলে বহুসংখ্যক কুম্ভকার বাস করিত। তাহার নিদর্শন স্বচক্ষে দর্শনও করিয়াছি। বোধ হয় এখানে কুমারের হাট ছিল বলিয়াই সাধুভাষায় কুমার হট্ট নাম হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপাখ্যান অনুক্রমণিকাতে দ্রষ্টব্য।

পুরুষ ও পুত্র কন্যাদি স্বজন বর্গের পরিচয় বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইলঃ—

"ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট, শান্ত, গুণানন্ত,
প্রসন্না কালীকা কৃপামই॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্ব গুণ যুত,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবী পুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রাম রাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালীকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥"

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর (৫৬, ১৪৮, ১৭০, ১৮৭ পৃঃ)

"জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মী নারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥

ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্ব গুণধাম ॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালীকা ॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা!
তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা ॥
জগদীশ্বরকে দয়া কর মহা মায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥ (ঐ ১৮৫ পৃঃ)
"শ্রীকবি রঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরাম দুলালে মাগো দেহি পদধূলি ॥"

(ঐ ৬৬, ১১৯, ১৮৫ পৃঃ)

"শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভনে কবিতা অদ্ভুতা ॥" (ঐ১০১ পৃঃ

বাসস্থান সম্বন্ধে :—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমার হট্টগ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম ॥
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥"

এতদ্দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি নির্দ্দোষ সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই বংশের আদিপুরুষ কৃত্তিবাস। "ধনহেতু মহাকুল" এবং 'দানশীল দয়াবন্ত' এই বাক্য দৃষ্টে ইহাই অনুমিত হয় যে সেই বংশ ঐশ্বর্য্য শালী ছিল এবং বংশধরগণ দানশীল ও দয়াবান্ ছিলেন কিন্তু রামপ্রসাদের পিতা বড় সম্পত্তি-শালী ছিলেন এমন বোধ হয় না।

কবিরঞ্জনের পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন এবং পিতার নাম রাম রাম সেন। রাম রাম সেনের দুই পরিণয়। প্রথমা স্ত্রীর গর্ব্ভে এক মাত্র পুত্র জন্মে, তাহার নাম নিধিরাম। দ্বিতীয়ার গর্ব্ভে চারি সন্তান। তন্মধ্যে দুইটী কন্যা, দুইটী পুত্র। প্রথমা অম্বিকা, দ্বিতীয়া ভবানী, তৃতীয় রামপ্রসাদ, চতুর্থ বিশ্বনাথ। কলিকাতা বাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সহিত রাম রাম সেনের দ্বিতীয়া কন্যা ভবানীর বিবাহ হয়। তাহার গর্ব্ভে জগন্নাথ এবং কৃপারাম নামক দুই

পুত্র জন্মে। রাম প্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম, সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী অম্বিকা ও সর্ব্বানুজ বিশ্বনাথের সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। রামপ্রসাদের রামদুলাল নামে পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল।

এই বংশাবলী আমরা রামপ্রসাদের স্বহস্ত হইতে প্রাপ্ত হইতেছি। অদ্যাপি রামপ্রসাদের যত জীবন চরিত লিখিত হইয়াছে তাহার কোনটীতেই এতদতিক্রামক কোন কথাই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমি এবার রামপ্রসাদের বাসভূমি পরিদর্শন করিতে গিয়া ও তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া একটী অতি প্রধান ঘটনা অবগত হইয়াছি; সেইটী এই যে রামপ্রসাদের রাম দুলাল নামক একমাত্র পুত্র ছিল এমন নহে। রামমোহন নামে তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। এই উভয় রামদুলাল সেন ও রামমোহন সেনের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু রামমোহন

সেনের বর্ত্তমান সন্তানগণই একটুকু সচ্ছন্দাবস্থাপন্ন। রামপ্রসাদের বংশ-বল্লী জীবনচরিতের শেষভাগে প্রকটিত হইল, তাহা দর্শন করিলেই বিশেষ জানা যাইবে।

এই স্থানে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন হইবে যে, যে রাম প্রসাদ ভাই, ভগ্নি, ভগ্নিপতি ও ভাগিনেয় প্রভৃতিরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আপনার তিনটী সন্তানেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার অপর একটী পুত্র থাকিলে, নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? এই প্রশ্ন অবিকল এই ভাষায় আমি কবিরঞ্জনের প্রপৌত্র, রাম মোহন সেনের পৌত্র, শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল কৃষ্ণ সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর," রচিত হওয়ার পরে তাঁহার পিতামহ জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং উক্ত পুস্তকে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই।

বৃদ্ধ বয়সে কবিরঞ্জনের স্ত্রী গর্ত্তবতী হইলেই

আজো গোঁসাই বলিয়াছিলেন "তুমি ইচ্ছাসুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা গুটী।" এইরূপ হইলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরী, মধ্যম পুত্র রাম দুলাল এবং তৎকনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরীর পরে, রামমোহন সেন কবিরঞ্জনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

রামপ্রসাদ বাল্যকালাবধি নিয়মিতরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি-ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কৌলিক চিকিৎসা ব্যবসায় শিক্ষা করেন নাই। দ্বাবিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি দার পরিগ্রহ করেন।

এইরূপ কথিত আছে যে যৌবনের প্রারম্ভেই পিতৃ-বিয়োগ বশতঃ সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হয়। ইতিপূর্ব্বেই আনুমানিক ষোড়শ বর্ষ বয়সে তাঁহার নৈসর্গিক কবিত্ব শক্তি ও ঈশ্বরানুরক্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রসাদের জীবন সাংসারিক কোন সুখ-সমৃদ্ধি

সাধনার জন্য নয়, ইহা প্রথম হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। অকস্মাৎ পরিবারের ভার তাঁহার উপরে পতিত হওয়াতে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় প্রায় হইয়াই যেন, তিনি চাকুরী নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতার কোন এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির * ভবনে এক মোহরের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। বিষয় কর্ম্মে তাঁহার বড় মনোনিবেশ হইতই না। তাঁহার জীবনের প্রথম সোপানেই তিনি এরূপ সাধনানুরক্ত ও বিষয় স্পৃহা-পরিশূন্য ছিলেন যে সাংসারিক কর্ম্ম করিতে কিসে কি করিয়া ফেলিতেন তাহার উদ্দেশও পাইতেন না। তিনি যে খাতায় মহাজনী হিসাবাদি লিখিতেন, তাহারই প্রত্যেক পৃষ্ঠার অবশিষ্ট স্থানে অসংখ্য দুর্গা ও কালী

* এই ব্যক্তি কে তাহা ঠিক করা যাইতে পারে নাই। জনশ্রুতি এরূপ যে, দেওয়ান গোলকচন্দ্র ঘোষালের ভবনে তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কেহ বলেন যে '৺ নবরঙ্গকুলাধিপ দুর্গাচরণ মিত্রই তাঁহার প্রভু।'

নাম এবং ভক্তিরস পরিপূরিত সঙ্গীত পূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

এক দিবস তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী ঐ খাতা দেখিতে পাইলেন এবং রামপ্রসাদের কীর্ত্তি দেখিয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত সেই খাতা স্বীয় প্রভুর নেত্রগোচর করিলেন।

কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া দুঃখ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় ইহা যেমন মনুষ্যের অপরি-জ্ঞেয়, কোন্ সূক্ষ্ম সূত্রে সুখ সৌভাগ্যের উদয় হয় তাহাও তেমনি জ্ঞানাতীত। প্রসাদের জীবনের এই ঘটনাটী নেত্রগোচর হইবামাত্র পাঠকের এই প্রতীতি জন্মে যে এই অপরাধে প্রভু তাঁহাকে অবমানিত ও অপদস্থ করিবেন। কিন্তু ঈশ্বরের কেমন অভাবনীয় নিয়তি! বিধাতার কেমন নিগুঢ় নির্ব্বন্ধ! এই ঘটনাই প্রসাদের জীবন-স্রোতের পথ পরিষ্কার করিল!! ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি অতীব ধীর, গুণগ্রাহী ও ঈশ্বর পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি প্রসাদের লিখাগুলি অভিনিবেশ

পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। সর্ব্বশেষে "আমায় দেও মা তবীলদারী" ইত্যাদি ১ম সংখ্যক সঙ্গীত পাঠ করিয়া একেবারে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন।

ক্ষুদ্র একগাছি খড় সঞ্চালন দেখিয়াই বায়ু কোন দিকে বহিতেছে ঠিক করা যায়। এই একটিমাত্র সঙ্গীত দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে প্রসাদের জীবন বৈষয়িক বা মহাজনীখাতা লিখা অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের কার্য্যোপযোগী। তিনি অমনি তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং কি জন্য এই দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামপ্রসাদ বিনীত ভাবে আপন সংসারিক অভাব জনাইলেন। ইহাতেই তিনি স্বকীয় বদান্যতা ও উদারতা গুণে, মাসিক ত্রিংশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া প্রসাদকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে—"আপনার আর অনিত্য সংসার চিন্তায় অনবরত ব্যাকুল হইবার কোন প্রয়োজন

নাই। আমি আপনাকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব, তল্লাভে পরিতুষ্ট হইয়া গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে দিনপাত করুন। আপনার পদার্পিত পদবী লাভ করা লোকের প্রার্থনীয়। তাহা হইতে বিরত করা আমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।"

এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া রামপ্রসাদ সংসারের ভার মুক্ত হইলেন। তাঁহার ঈশ্বর-প্রেম-পিপাসু মনচকোর এখন অধীনতারূপ পিঞ্জর মুক্ত হইল। অতঃপর বাটী যাইয়া তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ডী * আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক নিয়মিত সাধনায় প্রবৃত্ত হন। স্বাধীনতা কবিত্ব-প্রসূ; সুতরাং এই হইতে প্রসাদের কবিতা-কুসুমরাজি ঈশ্বর ভক্তি-গুণে গ্রন্থিত হইয়া তাঁহাকে ও সর্ব্বসাধারণকে পরমানন্দ বিধান করিতে লাগিল। তিনি শক্তি বিষয়ক

*সর্প, ভেক, শশ, শৃগাল, ও নৃমুণ্ডে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত হয়। কিন্তু রামপ্রসাদের আসনতলে সিন্দুর মণ্ডিত পাঁচটী নর মুণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও সাধন ভজনায় অহোর
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কাব্য, ভ
বন্দনাদি ব্যতিত, কেবল কালী বিষয়ক সর্ব
লক্ষাবধি রচনা করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ যখন বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া কুমারহট্টে বাস করিতেছিলেন, মহারাজা কৃষ্ণচ তখন তাঁহার গুণবত্বার পরিচয় প্রাপ্ত হন। নিজ অধিকার কুমারহট্টে কৃষ্ণনগরাধিপের একটি ধর্ম্মাধিকরণ ও বায়ুসেবনালয় ছিল। অবসর কালে তিনি তথায় আসিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেন। এই সময়ে রামপ্রসাদের সহিত নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শক্তি ভক্তি, বিষয়-বাসনা-পরিশূন্যতা, ঔদার্য্য ও কবিত্ব দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি রামপ্রসাদকেও রায়গুণাকরের ন্যায় আপন সভাসদ করিতে প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু রাম প্রসাদ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার হৃদয়

র কোনরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে বা
াকেও ভয় করিতে প্রস্তুত ছিল না। কেবল
করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়'
ই অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

াহা হউক গুণের উপযুক্ত পুরস্কারক এবং
দ্যার প্রকৃত উৎসাহদাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে
বিরক্ত না হইয়া রামপ্রসাদকে ১০০ বিঘা নিষ্কর
ভুমি ও কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করিলেন।
রাজ-দত্ত সনন্দে এইরূপ লিখিত আছে—
'গর্ আবাদি জঙ্গল ভুমি আবাদ করিয়া পুত্র
পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।'

ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তি এবং শতবিঘা নিষ্কর
ভুমির উপসত্ব ভিন্ন তাঁহার আয় বৃদ্ধির আরো
উপায় ছিল। সুললিত প্রসাদী সঙ্গীত শ্রবণে
এবং মনোরঞ্জন রচনা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইত।
সঙ্গীত বা কবিতার প্রয়োজন হইলে সকলেই
রামপ্রসাদের নিকট হইতে রচনা করিয়া লইত।
ইহার বিনিময়ে প্রসাদ কিছু চাহিতেন না, চাহি-

বার প্রয়োজনও ছিল না, কিন্তু কালীর ও কবিবরের প্রণামি স্বরূপ অনেকেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সবিনয়ে ভক্তির উপহার প্রদান করিত। উক্তত্রিবিধি আয়েরসূত্রাবলম্বন করিয়া ধনোপাসক ব্যক্তি অনায়াসে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত। কিন্তু রামপ্রসাদের মুক্ত হস্ত, অপরাহ্নে আহারের যোগাড় না থাকিলেও, দানের পাত্র দুঃখী দরিদ্র দর্শনে পূর্ব্বাহ্নে দান করিত। ধর্ম্মচিন্তা ভিন্ন অর্থ চিন্তা তাদৃশ জীবনের কার্য্য হইতে পারে না। আপনা আপনি ধন হস্তগত হইত। তিনি তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিতেন।

রামপ্রসাদ রাজদত্ত নিষ্কর ভূমি ও কবিরঞ্জন উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার প্রতিদানে একখানা কাব্য রচনা করতঃ 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' নাম দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন। এই কাব্য রচনায় তিনি আপন রুচি ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কেবল যাহাতে রাজার তুষ্টি সাধন হয় তাহাই করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কালী কীর্ত্তন'। কালী কীর্ত্তন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে ইহা পাঠক অনুমানেই বুঝিতে পারেন। যাঁহার সারা জীবন কালী সাধনা ও কালী কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইয়াছে তাঁহার 'কালীকীর্ত্তন' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়।

উক্ত কাব্যদ্বয় ব্যতীত কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিব সঙ্কীর্ত্তন নামক আরো দুইখানা কাব্যরচনা করেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পৃষ্ঠা দুই ভিন্ন অবশিষ্ট এবং শিব সঙ্কীর্ত্তন সম্পূর্ণ অপ্রাপ্য। সঙ্গীত সাধনা তাঁহার জীবনের মূল ব্রত ছিল। তিনি, স্থান, কাল ও ভাবনির্ব্বিশেষে অহোরাত্র সঙ্গীত রচনা করিতেন। ইহাতে কীর্ত্তিমান বা যশস্বী হইবেন, এমন ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উদয়ও হয় নাই। কারণ, রচিত সঙ্গীত কালি কাগজে নিবদ্ধকরা তাঁহার রীতি ছিল না, সময় এবং সুযোগও ছিলনা। তাঁহার সঙ্গীতাবলীর সহস্র ভাগের একভাগও যে পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে এইটিই তাহার প্রধান কারণ। শক্তি

সাধনার জন্য নিত্য নূতন সঙ্গীত রচনা করিতেন। রচিত সংগীত কেমন হইল, পুনশ্চ ভাবিয়া দেখিতেন না। লোক দেখান বা যশোলাভ অপেক্ষা অতিমহৎ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কবিত্বের ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই বাধ্যবাধকতায় বিরচিত কাব্য—বিদ্যাসুন্দর ভিন্ন তাঁহার আর সকলই গীতি-কাব্য। গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা সঙ্গীত সাধনাই যে তাঁহার প্রিয়তর কার্য্য ছিল, তাঁহার নিজ বাক্যেই সপ্রমাণিত হয়। তিনি বিদ্যাসুন্দরে এক স্থানে বলিতেছেন 'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত'।

রামপ্রসাদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। রাজা তৎসহবাস অতীব সুখদ মনে করিতেন। এক সময়ে রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গে মুরশীদাবাদ গমন করিয়াছিলেন। অবসর সময়ে রাজার সহিত গঙ্গাপথে নৌকায় পরিভ্রমণ করতঃ কালীর নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেই সময়ে জল

বিহারে বহির্গত হইয়া সেই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে ডাকিয়া আপন নৌকায় আনিলেন এবং গান করিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের প্রিয় হইবে বলিয়া হিন্দি খেয়াল ও গজ্জাল গান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন—'না না ওগান নয়। ঐ নৌকায় কালী কালী শব্দে যে গান গাইতে ছিলে সেই গান গাও।' অতঃপর রামপ্রসাদ শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই অমিয়-স্রোতস্বরূপ প্রসাদীসঙ্গীত-প্রবাহ সিরাজের পাষণ হৃদয়কে প্লাবিত, বিগলিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

রাম প্রসাদের সুকবিত্ব পূর্ণ সঙ্গীত পাঠে এবং উপরি উক্ত ঘটনা দৃষ্টে তাঁহাকে অতি সুগাথক বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার স্বর তত সুমিষ্ট ছিল না, তথাপি স্বরচিত সঙ্গীত গানে তাঁহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য

ছিল যে বাস্তবিকই তিনি পাষাণ দ্রব করিতে পারিতেন।

কবিবর রামপ্রসাদ সেনের জীবনের সঙ্গে কুমারহট্ট নিবাসী জনৈক অযোধ্যারাম গোস্বামীর জীবনের বিশেষ যোগ আছে বলিয়া এখানে তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। গোস্বামী মহাশয় সাধারণতঃ আজো গোঁসাই বলিয়া পরিচিত। তিনি রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী ও সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহাকে অনেকে পাগল মনে করিত, কিন্তু তিনিও যে একজন সুভাবুক কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর পাগল হইলেও, কাজের পাগল বলিতে হইবে। রামপ্রসাদ কালী ভক্ত, ইনি হরি ভক্ত। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চির প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের মধ্যেও তাহা বর্ত্তমান ছিল। রামপ্রসাদ যখন যে গান করিতেন বা কথা বলিতেন, গোস্বামী মহাশয় তাহার ব্যাঙ্গোক্তি সুচক গান ও বাক্য দ্বারা তাহার পাল্‌টা উত্তর প্রদান করিতেন। ইহাঁর উক্তবিধ উত্তরও অনেক ছিল, কিন্তু অতি

অল্পই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানে যে কয়েকটী প্রত্যুত্তর প্রকটিত হইল, তদ্দৃষ্টেই গোঁসাই কবির ভাবুকতার কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাম প্রসাদ গান করিলেনঃ—

আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।। (৬ সং)

আজো গোঁসাই উত্তর দিলেনঃ—

পেসাদে তোর যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখবি রে তোর মেসো আর মাসী॥

রাম প্রসাদের গানঃ—

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লূটি॥ (৫১ সং)

আজো গোঁসাএর উত্তরঃ—

এই সংসার সুখের কুটি।
ওরে খাই, দাই, মজা লুটি॥
যার যেমন মন, তেম্নি ধন মন কররে পরিপাটী॥
ওহে সেন, অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি॥
ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটী॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতেই ছিলনা ত্রুটি। সে যে

এ দিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটী॥
রামপ্রসাদের গানঃ—আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুর তলে রে,চার ফল কুড়ায়ে খাবি॥(৯২সং)
আজো গোঁসাইর উত্তরঃ—
বলেন রাম প্রসাদ কবি, 'আয় মন বেড়াতে যাবি,'
তার কথায় কোথাও যেওনারে, সাধকের মনের ভাব সে কি জানে রে?
রামপ্রসাদের (৫১ সং) সঙ্গীতের এক অংশঃ—
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥

রাম প্রসাদের বৃদ্ধ বয়সে যখন আর একটী বার তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন, তখন গোঁসাই যে সঙ্গীত রচনা করেন তাঁহার অধিক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল সতীত্বের উদ্দেশ্য বিষয়ক বাক্যটী ধারাবাহিক চলিয়া আসিয়াছে। তাহা এইঃ—

তুমি ইচ্ছা-সুখে ফেলে পাশা, কাঁচায়েছ পাঁকা গুটী।

গোঁসাই কবিও কি চমৎকার ভাবুক, রসিক ও উচিৎ বক্তা ছিলেন।

রামপ্রসাদের গানঃ—

মুক্ত কর মায়াজালে। (সমগ্র সঙ্গীত পাওয়া যায় নাই)

আজো গোঁসাইর গানঃ—

বন্ধ কর মা ক্ষেপলা জালে। যাতে চুন পুঁঠি এড়বেনা,

মজা মারব ঝালে ঝুলে॥

রামপ্রসাদের গানঃ—

শ্যামা ভাব সাগরে ডুবনারে মন! কেন আর বেড়াও

ভেসে? (সমগ্র সঙ্গীত পাওয়া যায় নাই।)

আজো গোঁসাইর উত্তরঃ—

একে তোমার কোঁপো নাড়ী ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।

হইলে পরে জ্বর জাড়ি, যেতে হবে যমের বাড়ী॥

কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তনে লিখিলেনঃ—

গিরীশ গৃহিণী গৌরী গোপ বধূ বেশ।

কসিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস॥

সুরভি পরিবার সহস্রেক ধেনু।

পাতাল হইতে উঠে শুনে মায়ের বেণু॥

গোঁসাই উত্তরে লিখিলেনঃ—

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ব,

মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।

তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে।

রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেনঃ—

কর্ম্মেরঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট, মোলেও যায়না।

এইস্থলে "পাগলের ছাট" কথায় গোস্বামীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুন্দর উক্তি।

গোঁসাই উত্তরে বলিলেনঃ—

কর্ম্ম ডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর, মোলেও যায় না।

এই স্থলে "মদের ঘোর" বাক্যে কবিরঞ্জনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। চমৎকার প্রত্যুক্তি!!

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালী ভক্ত ছিলেন, সুতরাং কালী ভক্ত রাম প্রসাদের কবিত্ব-তরুমূলে জল সেঁচন করিতে ক্রুটী করেন নাই; তাহাতেই সেই বৃক্ষে কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শিব-সং-কীর্ত্তন, ও কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর এবং অগণিত সঙ্গীতাবলী স্বরূপ কাব্যপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। হরিভক্ত গোঁসাই কবির কবিত্ব-তরু জলসেক প্রাপ্ত হইলে যে যথেষ্ঠ পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিত সন্দেহ কি?

কুমার হট্টে অবস্থিতি কালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাম প্রসাদ ও আজো গোঁসাইকে একত্রে করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব দেখিতেন এবং আমোদ করিতেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে আজো গোঁসাই ক্রমেই বাড়াবাড়ি করিতেছেন, তখন আর ঐরূপ সঙ্গীত রচনা না করিতে আদেশ করেন। ইহাতে প্রকারান্তরে মহারাজ গোঁসাই কবির কবিত্ব-শক্তি বিকাশের অন্তরায় হইয়াছিলেন বলিতে হইবে।

কবিরঞ্জনের এমন অসামান্য কবিত্ব ও রচনা শক্তি ছিল যে সঙ্গীত রচনায় তাঁহাকে তিলার্দ্ধ ভাবিতে হইত না। যে কয়টি ঘটনা জানা গিয়াছে তাহাতেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

প্রবাদ এরূপ যে একদা রামপ্রসাদ স্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময়, অন্নপূর্ণা স্বয়ং ষোড়শী মানবী বেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গান শুনিতে বলেন। স্নানান্তে আসিয়া তিনি আর ঐ যুবতীকে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু শূন্য বাণীতে শুনিতে

পাইলেন " আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না, তুমি কাশীতে গিয়া অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবে" এতৎ শ্রবণে রাম প্রসাদ আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ না করিয়াই ' মন চলরে বারাণশী ৭ আমি কবে কাশী বাসী হব' ইত্যাদি (১০৬ সং) গান করিতে করিতে মাতৃ সমভিব্যাহারে কাশী চলিলেন। রাত্রিতে কোন এক গৃহস্থ বাটীতে অবস্থিতি কালে কাশী গমন অনুধ্যান করিতেছেন, ইতিমধ্যে আবার আদেশ হইল " কাশী যাওয়া অনাবশ্যক, এখানেই সংগীত করিতে হইবে।" তখন আবার গাইলেন—" কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী। কালীর চরণে কৈবল্য রাশি।" (৪১ সং)। "আর কাজ কি আমার কাশী। ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥" (৬ সং)। এই যাত্রায় তাঁহার কাশী যাওয়া হয় নাই।

রামপ্রসাদ তীর্থ পর্য্যটন না করিতেই কৃত সঙ্কল্প ছিলেন, কিন্তু কাশী যাওয়ার অভিযোগ হও-য়াতে আর একবার কাশী গমনে ইচ্ছা হইলে পরও

গান করিলেন—'মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে। বট মনোময়ী শান্তনা কর না কেন এই মনে ॥ * * কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে ॥' (১৭২ সং)।

অভিযুক্ত পুরী গমনে আবশ্যক নাই বলিয়াও এইবার রামপ্রসাদ কাশী গিয়াছিলেন, এবং সমুদয় দেবতা পরিদর্শন করিলেন, কিন্তু বেণীমাধব দর্শন করেন নাই। অন্নপূর্ণা বেণীমাধব রূপে স্বপ্নে রামপ্রসাদকে দেখা দিলেন। তখন স্বপ্নান্তে জাগ্রত হইয়া গান করিলেনঃ—"কালী হলি, মা, রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে ॥" (১৭৯ সং)

রথ যাত্রার সময় রাজা নব কৃষ্ণ, রামপ্রসাদ সহ পরিভ্রমণ ক্রমে, সময়োচিত সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলে, কবিরঞ্জন গাইলেন—" কালী কালী বল রসনারে। ঐ ষট চক্র রথ মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥" (১৫০ সং)।

দোল যাত্রার সময় রাজা নবকৃষ্ণ আবার প্রসাদকে বলিলেন যে সময়োচিত সঙ্গীত কর। তাহাতে

রামপ্রসাদ গাইলেনঃ—"হৃৎ কমলে মঞ্চদোলে করাল বদনী শ্যামা। মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ওমা॥" (৩৩ সং)।

একদা রামপ্রসাদ চড়ক পূজা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় বসিয়া এই সঙ্গীতটী দ্বারা আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। "ওরে মন চড়কি চড়ক কর এ ঘোর সংসারে।" (৬০ সং)

রামপ্রসাদ শক্তিসাধক হইলেও তাঁহার সাধনার রীতিনীতি তান্ত্রিকের মত ছিল। সুতরাং তিনি কৌলিক ক্রিয়াধীন ছিলেন; অর্থাৎ সাধনায় মনোনিবেশার্থে কিছু সুরা পান করিতেন। একদা স্বগ্রামবাসী বলরাম তর্কভূষণ নামক একজন তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন। পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন দেখ দেখ 'মাতাল ব্যাটা যাইতেছে'। উদারচিত্ত রামপ্রসাদ ইহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া এই দুটী সঙ্গীত দ্বারা আত্মাভিমানী পণ্ডিতকে যথোচিত প্রবোধ প্রদান করিলেন;—

'রসনে কালীনাম রটরে' (৪২ সং)। 'মন ভুলনা কথার ছলে' (৪৩সং)।

রাম প্রসাদ এই দৃশ্যমান্ সাকার কালীর তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন না (৪৮,১৫৫ সং)সুতরাং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন তোমার কালী কেমন? তিনি উত্তর দিলেন—'কে জানে গো কালী কেমন?' (৩৬ সং)। প্রশ্ন হইল গঙ্গাবাসী হওনা কেন ? তিনি উত্তর দিলেন 'কেন গঙ্গাবাসী হব।' (৬২ সং)।

রাম প্রসাদের জীবনে যে সকল অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার প্রথমটী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্নপূর্ণা তাঁহাকে কাশী যাইতে আদেশ করেন। দ্বিতীয় এই যে স্বয়ং ঈশ্বরী তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী রূপে তাঁহার ঘরের বেড়া বাঁধিয়া দেন। তৃতীয় এই যে স্বয়ং শিবা শিবারূপে তাঁহার হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। চতুর্থ এই যে গাব গাছ হইতে পদ্ম নাবাইয়া কালী পূজা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্নও আছে।

এই সকল ঘটনা সাংসারিক ভাবে অলৌকিক ও

অসম্ভব, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে নিতান্ত সম্ভব। ঈশ্বর স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়া মনুষ্যকে সৎপথে যাইতে আদেশ করেন, পাপ-ভার-ভগ্ন আত্মার জীর্ণ সংস্কার করেন, এবং সাধক প্রার্থনা করিলে সকল সময়েই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করেন, এবং অসম্ভব সম্ভব করেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? পঞ্চমটী অলৌকিক নহে। অনেক ধীর ও জ্ঞানী মনুষ্যই মৃত্যুর আসন্ন কাল টের পাইয়া থাকেন। রাম প্রসাদও পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াই যেন কালী পূজা করেন। পর দিবস বিসর্জ্জনের সময় অন্যান্যের সঙ্গে শক্তি গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে জাহ্নবী তীরে উপস্থিত হন। তথায় অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান থাকিয়া 'মৃত্যুর প্রাক্কালিন সঙ্গীত চতুষ্টয়ের শেষ সঙ্গীতের উপসংহারে "মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে' এইবাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই। ভাবে মৃত্যু।

কবি রঞ্জনের বংশ-বল্লী।

রামপ্রসাদ সেন।

- পরমেশ্বরী,
- রামদুলাল,
  - রাজচন্দ্র সেন
    - কালাচাঁদ সেন ও শ্রীগোরাচাঁদ সেন
- রামমোহন,
  - জয়নারায়ণ সেন
    - শ্রীগোপালকৃষ্ণ সেন
      - শ্রীকালীপদ সেন।
        জনৈক য্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার।
  - শ্রীদুর্গাদাস সেন
- জগদীশ্বরী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অর্থাৎ

প্রসাদী-সঙ্গীত।

বিভাগ।

প্রসাদী সঙ্গীত।
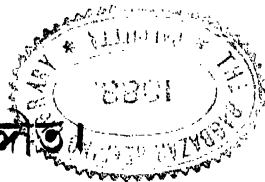
(বিবিধ বিষয়ক)

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী ॥
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারী।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির্, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায় চাকর্, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী ॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই লয়ে আমি মরি।
ওপদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥১॥ *

* যতদূর জানা গিয়াছে—এইটীই প্রসাদের প্রথম সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন; দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুল কুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি রূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোবেনা তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রাম প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে॥২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেনরে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত। ওরে তুই করিস
কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত॥

একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত।
ওমন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত। যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি,'হবেরে তোর তেম্নি মত॥
দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত।
ওমন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত। একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কু মাতা নয় কখন-তো।
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥৪॥

"দ্বিজ রাম প্রসাদ" ভনিতাযুক্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, উপক্রমণিকাতে বিবৃত হইল।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥

নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥

পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে। তারা কারো কথা কেও শুনে না, দিন তো আমার গেল ঘেটে॥

যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে। আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দে না কেটে। প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যে ফেটে॥ ৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥

হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥

কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলা রাশি॥

গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসী ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোণা।
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না। এখন আপন ভেবে,,(মন রে আমার) যতন করে, চুটয়ে ফসল, কেটে নে না ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচনা।

ওরে একা যদি (মন রে আমার) না পারিস্ মন, রাম প্রসাদকে ডেকে নে না ॥ ৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥

ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বলব এবার যারে তারে। সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন বিচারে ?

পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বলব তারে। ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥

মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে ? ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥

শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে। রাম-প্রসাদ বলে ভয় করিনে, মার অভয় চরণের জোরে ॥ ৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥

নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বলে ; চলে যাব যথা তথা। আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা ॥

তুমি গো পাষাণের সুতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা। রামপ্রসাদ বলে, হৃদি স্থলে, গুরু তত্ত্ব রাখ গাঁথা ॥ ৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেতা ॥

মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা। যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥

তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ? যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা ॥

প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা। ওমা যেজন তোমার নাম করে, তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁতা ॥ ১০ ॥*

---

* এক ধূয়াতে দুইটী সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, কি একটী সঙ্গীতই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, অথবা দুইটী সঙ্গীত মধ্যে একতরের ধূয়ায় লুক্কায়িত হইয়াছে, কিছুই ঠিক করা গেলনা।

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করিলা শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড় দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা, মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর। রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভোর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥ ১১॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥

রাম প্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥ ১২ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
আমি কায হারালেম কালের বশে ॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করে ছিলেম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্দ্ধন বলে সবাই রোষে ॥
যম আসি শিয়রে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে ॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥১৩॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

ভবের আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাঁজুরি পলো ॥

পবার আঠার ষোল,. যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কাচ্চা বার পেয়ে মাগো পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥
ছ দুই আট, ছ চার দশ কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হইল ॥১৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হ'লো॥
দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে, এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রলো॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে পীলের কিস্তে মাত হইল ॥১৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা॥
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, করোনা একথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাসা॥
প্রসাদের মন হও যদি মন কর্ম্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥ ১৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কি, দুখেরে ডরাই?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥

বিষের ক্রিমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই। আমি এমন বিষের ক্রিমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই। দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই ॥ ১৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না রে মনরে ঠেঁটা ॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে মন, কোথা রবে খুড় জেঠা ॥
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে রে যে জাবদাআটা ॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রাম প্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়রে সংসারের লেঠা ॥ ১৮ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপ।

ভাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসী ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে কর্‌তে পারে জোর ॥

কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর ॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল রাম প্রসাদ কি চোর ॥ ১৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন অবিচারে আমার'পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাণ্ডি, তারে দিলে জমিদারী ॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপে মা আমি হারি ॥
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি। ছিল,
স্থানের মধ্যে অভয় চরণ তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি ॥ ** ॥ ২০ ॥

যে যে স্থানে * * এইরূপ যোড় তারকা চিহ্ন আছে, সঙ্গীতের সেই সেই অংশ প্রভূত প্রয়াসেও পাইতে পারি নাই।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা, আমায় হলে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে। রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী বলে ॥ ২১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ড যোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে। এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুইটার একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব ॥

হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরাম প্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥ ২২ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়খেম্‌টা।

আমার কপাল গো তারা!
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে ॥
শিশু কালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্প মতি, ভাসালে সায়রের জলে ॥
স্রোতের সেহলার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে ॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণ তলে ॥
শ্রীরাম প্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তনু অন্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে ॥ ২৩ ॥

রাগিণী সোহিণী বাহার—তাল আড় খেমটা।

ওমা! হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদে এই ভনে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে। তবু রব মার চরণে, আরত ভবে জন্মিব না॥ ২৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
তনয় থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভাল বাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ। দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা মাঝখানে ফাঁড়া॥

যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালীকাতারা। বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥ ২৫॥

প্রসাদীর সুর—তাল একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতি দিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে॥

মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশে। তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥

মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে। কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়া পাশে॥

কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাসে। আমার সেই যে কালী, মনের কালী, হলেম কালী তার বিষয় বশে॥ ২৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি॥

যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি। ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি ॥

কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি। ওরে, পড় বাবা আত্মারাম, আত্ম জনের কর গতি ॥

উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি। ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি ॥

প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুকতি। ওরে, বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥ ২৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।

তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা ॥

তুমি পাষাণ-মেয়ে, বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ ॥

উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ। যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ ॥

বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ। যেজন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥

প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ। তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ ॥ ২৮ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

মন কালী কালী বল।

বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ও মন, কেন ভুল॥

কিঞ্চিৎ করো না ভয়, দেখে অগাধ সলিল। ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কূলাইবেন কূল॥

যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল। এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল, ভব পারাবারে চল॥

শ্রীরাম প্রসাদে বলে, কেন মন ভুল। ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হইল॥ ২৯॥

রাগিণী মূলতান – তাল একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না;
রসনা! যা হবার তাই হবে॥

দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে), না আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?

রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে, নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে। সচেতনে থেক (মনরে আমার), কালী বলে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে॥ ৩০॥ ***

---

* পুস্তকান্তরে দৃষ্ট হইল যে এই সঙ্গীত হরু ঠাকুর দ্বারা বিরচিত, এবং ইহার ধূয়া "হরির নাম লইতে অলস হইও না" এইরূপ। এ সম্বন্ধেও স্থির মীমাংসায় পঁহুছা গেল না।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রাম প্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে॥ ৩১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে, আরকি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি॥ মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥ ৩২॥

রাগিণী গাড়া ভৈরবী—তাঁল আড়া।

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥

ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না * মনোরমা। তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥

আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়। কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥

যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল। রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥ ৩৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে তোর বুদ্ধি একি!
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে,তালাস করে বেড়াস ফাঁকি॥

ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।

---

* শরীরস্থ সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না এই তিনটী সর্ব্ব প্রধান।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রাম প্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে॥ ৩১॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥ ঘুম ছুটেছে, আরকি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি। এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥ সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি॥ মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥ ৩২ ॥

রাগিণী গাঢ়া ভৈরবী—তাল আড়া।

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥

ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না * মনোরমা। তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥

আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়। কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥

যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল। রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥ ৩৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে তোর বুদ্ধি একি!
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে,তালাস করে বেড়াস ফাঁকি॥

ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।

---

* শরীরস্থ সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না এই তিনটী সর্ব্ব প্রধান।

মনরে, ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে না কি ॥

জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা। মনরে, যখন বলবে তাত সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী॥ ** ॥ ৩৪ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী পদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্ম পাশ ফেল কেটে ॥

নিতান্ত বিষয়াশক্ত মাথায় কর বেসার বেটে। ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥

সতত ত্রিতাপের তাপে (১) হৃদি ভূমি গেল ফেটে। নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে ॥

নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে। পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ চেটে ॥

রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেটে। এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥ ৩৫ ॥

---

(১) ত্রিতাপ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন।

ষড় দর্শনে না পায় দরশন ॥

কালী পদ্মবনে * হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ। তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন ॥

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন। তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন। আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন ॥ ৩৬ ॥

রাগিণী মুলতান তাল—একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।

ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার নফর ॥

---

* ষট্‌পদ্ম বা ষড়চক্র যথাঃ—১ম, মূলাধার; ২য়, স্বাধিষ্ঠান; ৩য়, মণিপুর; ৪র্থ, অনাহত; ৫ম, বিশুদ্ধাখ্য; ৬ষ্ঠ, সহস্রার বা আজ্ঞা।

১ম, চতুর্দ্দল পদ্ম। ২য়, ষড়দল পদ্ম। ৩য়, দশদল পদ্ম। ৪র্থ, দ্বাদশদল পদ্ম। ৫ম, অষ্টাদশদল পদ্ম। ৬ষ্ঠ, সহস্রদল পদ্ম। এই স্থলে এই পদ্মবন বুঝিতে হইবে।

মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর। ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন) ॥

দ্বিজরাম প্রসাদে বলে, তারার নামটী সার। ওরে মিছে কেন দারা সুতের, বেগার খেটে মর (ওরে মন) ॥ ৩৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না ॥

ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা ১ ॥

ব্যজনে পবন বাস (২) চালনেতে সুপ্রকাশ। মনরে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥

কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল। মনরে ওরে, সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা ॥

---

(১) লহনা—বাকী, অনাদায়। এই একটী প্রাচীন মত আছে যে ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া এইরূপ প্রতিশ্রুত থাকেন যে সাধনা করিলে মুক্তি দিবেন। যখন সৃষ্টি করিয়াছেন, মুক্তি দিতেও তিনি বাধ্য আছেন।

(২) ব্যজন—পাখা। যেরূপ পাখাতে বায়ু বাস করে, কিন্তু সঞ্চালনাভাবে প্রকাশ পায় না, সেইরূপ প্রত্যেক আত্মাতে ঈশ্বর আবির্ভূত আছেন, কেবল সাধনাভাবে উপলব্ধি হয় না।

ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন। মনরে ওরে, শ্রীনাথদত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোল না॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, * বুড়া দাদা দিদী ঘাতী। মনরে ওরে, জনন মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা॥

প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনেলে আপনারে। মনরে ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কি বা বিবেচনা॥ ৩৮॥

রাগিণী গাঢ়া ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাপার।

ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার॥

যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি। তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার॥

বহিছে তোফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবি-

* মনের দুই স্ত্রী, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান, নিবৃত্তির সন্তান বিদ্যা বা জ্ঞান, জ্ঞানের সন্তান প্রবোধ। প্রবোধ জন্মিলেই প্রবৃত্তির নাশ হয়। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক দেখ।

রাম। পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার ॥

কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন। এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ॥ ৩৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে আমার ভুলা মামা।
ও তুই জানিস না রে খরচ জমা ॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি।
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা ॥
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবীল বাকী।
তহবীল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ, কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি, কালীতারা উমাশ্যামা ॥ ৪০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি ॥

সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভূজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশী॥ ৪১॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

রসনে কালী নাম রটরে!
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজদেছে ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস।
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম।
করে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎকটরে॥
শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, দ্বিঅক্ষর কর মনে।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে॥ ৪২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন ভুলনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥

সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে। আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥

অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে। নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয় মদ খাইলে॥

যন্ত্র (১) ভরা মন্ত্র সোঁড়া, অগু ভাসে যেই জলে (২)। সে যে অকুল তারণ, কুলের কারণ, কুল(৩)ছেড়না পরের বোলে॥

ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে। সত্ত্বে ধর্ম্ম তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম, হয় মন রজ মিশালে॥

মাতাল হলে বেতাল (৪) পাবে, বৈতালী (৫) করিবে কোলে। রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥ ৪৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥

---

(১) যন্ত্র—বোতল, সুরার ফায়েল।

(২) সুরা, সমিতা, ও তরিতা ঘটিত কারণ বারি।

(৩) কৌলিক (তান্ত্রিক) ক্রিয়া কলাপ।

(৪) বেতাল—শিব।

(৫) বৈতালী—কালী।

সুরা পান করিনে রে, সুধা খাই রে কুতুহলে। আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥

খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে। যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে ॥

দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়া, বাড়য়ে রোগ। ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, খুধা খাই জয় কালী বলে ;
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।

গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা ; আমার জ্ঞান সুরীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।

মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা ; রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥ ৪৫ ॥*

---

* এই তিনটী সঙ্গীত এক বিষয়ীভূত, এক ভাবাত্মক, এবং কোন কোন স্থলে এক ভাষায় বিরচিত। এইরূপ এক সঙ্গীতের দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ পাঠান্তর, এক এক কথার পুনঃ পুনঃ উক্তি ও এক ভাবাত্মক অনেকানেক সঙ্গীত দ্বারা, ইহাই প্রমাণিত হয় যে রাম প্রসাদ অতর্কিতভাবে সঙ্গীত রচনা করিতেন।

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই। মনরে ওরে, মিছেমিছে সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক ॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা। মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ ॥
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে। মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক্ ॥
প্রাজ্ঞ, অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ। রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ ॥ ৪৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে ॥
হেদে গো মা দশ ভূজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা। আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে ॥
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী। যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে ॥

দ্বিজরাম প্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে। আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ॥ ৪৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।

ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥

মন অগ্রে শশী (১) বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে। ওরে কোটার ভিতর চোর কোটরি, (২) ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥

ষড় দর্শনে দশন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্র সারে। সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে (৩) ॥

সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে। হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥

---

(১) শশী—কাম। কাম সর্ব্বাগ্রে দমন করিবে।

(২) চোর কোটরি—গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত কোটা।

(৩) পুরে—আত্মাতে। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজন ব্রহ্ম নিষ্কলম্।"

প্রসাদ বলে মাতৃ ভাবে. আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥ ৪৮॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন। দুরন্ত শমন বাঁধবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার। অনিত্য সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ না॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল। প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল যম যন্ত্রণা॥ ৪৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস নারে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে। ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্ নারে বসে বসে॥

মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে নিশে। যখন অজপা (১) পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে। দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে॥ ৫০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥

ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী। যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটি। ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী। আগে, ইচ্ছা-সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি। ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী॥৫১॥

---

(১) "হং, সঃ" অর্থাৎ সোঽহং ইত্যাদি জপ। শ্বাস প্রশ্বাস।

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।

আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি। ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিকারী ॥

জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি। ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে, যান্‌নি সেই, ব্রজেশ্বরী ॥

নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি। ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি। যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥ ৫২ ॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

এবার কালী কুলাইব।

কালি কোসে কালি বুঝে লব ॥

সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব। আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদি পদ্মে নাচাইব।

কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব। আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥

কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে, কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী কালী না ছাড়িব ॥৫৩

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

একবার ডাকরে কালীতারা বোলে, জোর করে রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে ॥
ভজনের ছিল আশা, সূক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা। রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বি ভাব ভেবে মনে ॥ ৫৪ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়া।

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ। মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ ॥

স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন। বিষয় জানিবে তেমন. হলে নিদ্রা ভঙ্গ ॥

অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কুপে পড়ে। কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥

এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে। তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥

প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা। অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ৫৫ ॥

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্ররে। শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হরে ॥

জাগা ঘরে চুরি করা, ইতে যদি পড়ি ধরা। তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥

গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে। ভক্তিবান হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥ * * ॥৫৫॥

রাগিণা সোহিনী বাহার—তাল একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥

কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না, তায় বা ক্ষতি কি মোর। হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি, এবার এবাজী ভোর গো ॥

এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর। এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি, কি জোরে করিব জোর গো ॥

আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর। শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥

এমা ঘোর মহানিশী, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর। আমার একুল ওকুল, দুকুল, গেল, সুধা না পেলে চকোর গো ॥

এমা, আমি টানি কুলে, মন প্রতিকুলে, দারুণ করম ডোর। রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥৫৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥

এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধূলা ধূলি। আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি ॥

ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি। রাম প্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলে কাঁথা ঝুলি ॥৫৭॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।

কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥

যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়। ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনি তো দেখায় ॥

যে জন গৃহ স্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়। এমা, তুমিতো অন্তরে জাগ, সময় বুঝ্‌তে হয় ॥

যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরু তলে রয়। ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা, এ বড় সংশয় ॥

প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়। ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের আশায় ॥ ৫৮ ॥

প্রসাদী সুর তাল একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।

সদা গান কর পান কর এটা॥

ওরে ধিকরে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স্ পিঠা॥

নিরাকার সাকার ককার, সবাকার ভিটা। ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কিটা॥

কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা। সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাত তালীটা॥

জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা। তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব কর যত্ন যেটা॥

প্রসাদ বলে হৃদি ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা। আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর, দেবত্ররের দাগা চিঠা॥ ৫৯॥

রাগিণী জংলা একতালা।

ওরে মন চড়কি চরক কর, এ ঘোর সংসারে।

মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥

যুগল স্বয়ম্ভূ শম্ভূ যুবতীর উরে। মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাহারে॥

ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে (১) বাজিছে ঢাক। মনরে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালী, বাজায় বারে বারে॥

কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে। মনরে ওরে এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥

দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ। মনরে ওরে, মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥

প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার। মনরে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি, ডাক ফেলে মারে॥ ৬০॥

প্রসাদী সুর তাল একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেটা।

আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা।

শ্মশান পেলে ভাল বাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা। মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলনা আর সিদ্ধি গুটা॥

যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা। তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছালি আর মাথায় জটা॥

ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহাপিটা। আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥

---

(১) গাজন—চৈত্রোৎসব। চড়ক পূজা।

চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরাম প্রসাদ কালীর বেটা। এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥ ৮১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কেন গঙ্গা বাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গায়িব॥

আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব। কালীর চরণ তলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখতে পাব॥

শ্রীরাম প্রসাদে বলে, কালীর পদে শরণ লব। আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥ ৮২॥

রাগিণী গৌরী গান্ধার—তাল একতালা।

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥

ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী; ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, মা বলে আর কোলে যাবনা।

ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে. মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে ; মা বিদ্যমানে, এদুঃখ সন্তানে, মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না।

ভনে রাম প্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু ; দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন কঠোর যন্ত্রণা ॥৬৩॥

প্রসাদীসুর তাল একতালা।

সামাল্ সামাল্ ডুবল তরী।

আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হর সুন্দরী ॥ প্রবঞ্চনার বিকীকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী। সারা দিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যা বেলা ধরলে পারী ॥

একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারি। যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী।

তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী। এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, যিনি হন ভব কাণ্ডারী ॥* * ॥৬৪॥

প্রসাদীসুর—তাল এক তালা।

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা॥

দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ। তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাও গো জগন্মাতা॥

শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গ দাতা। রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, রাখ্‌বে রাখ এই কথা॥ ৬৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনু তরণী ভব সাগরে ডুবাইলাম।

এ ভব তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম। তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম॥

বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম। মন ডোরে ওচরণ হেলে না বাঁধিলাম॥

প্রসাদ বলে মাগো, আমি কি কাজ করিলাম। আমার তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥ ৬৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পতিত পাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নামটী সারা॥

ঐ যে তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা॥

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল। তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণি হারা॥

ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই। ঙয়ায় সয় তয় রয় (১) সেইরূপ বর্ণ পারা॥

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা। লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥

পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলাম ভজে। দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চারা॥

আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ। কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা॥

বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে। প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥৬৭॥

---

(১) ঙয়ায়, সয়, তয়, রয়, ঙ্ স্ত্র।

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালা।

দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোজে খোজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥ ৬৮॥

প্রসাদী স্বর—তাল একতালা।

মন করোনা দ্বেষা দ্বেষি!
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠ বাসী॥

আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজ তালাসি। ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥

শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী। ওমা রাম-রূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী। শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী। যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি। আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥ ৬৯ ॥

রাগিণী লগ্নী—তাল আড়খেমটা।

মা বসন পর।

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি। চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥

কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী। বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥

পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী। কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥

কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে করেছে সেবা। শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো ॥

ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি। কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥

অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ড মালা। হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥

মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগণে। মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥

আপনে পাগল পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে। দ্বিজরামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥ ৭০॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।

এই লোক্‌সানি মহাল লয়ে বেঁড়াই আমি॥

পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমী। তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥

আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি (১)। মাগো এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামরামি॥

গঙ্গা যদি গর্ব্বে টানে, লইল এই ভূমি। কেবল কথা রবে কোথা রব, কোথা রবে তুমি ** ॥ ৭১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।

(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা)

যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

---

(১) হামি—হাঁই।

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা। এখন ক্ষুধার বেলা সুধালেনা, এল পুত্র গেল কোথা ॥

সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা। দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা ॥

দ্বিজরামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা। যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥ ৭২ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কি আটাসে ছেলে।
ভয়ে ভুলব নাকো চোক রাঙ্গালে ॥

সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে। ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥

শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে। এবার করব নালিশ নাথের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥

জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে। যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রাম প্রসাদ বলে। আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়, শান্তকরে লবে কোলে ॥ ৭৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা॥
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥

চেননা আমারে শমন্, চিনলে পরে হবে সোজা। আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা॥

ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা (১) হাজা (২)। দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা॥

প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা। ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জাননা সেই পদের মজা॥ ৭৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে।

আমি কালীর সুত, যমের দূত, বলগে যা তোর যম রাজারে॥

সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি। আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দী বরে॥

সনদ আমার উরস্ পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে। তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দীরস্বরে * *॥ ৭৫॥

---

(১) শুকা—জলাভাবে শস্য নাশ।
(২) হাজা—জলপ্লাবনে শস্য নাশ।

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

তুই যারে কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি॥

হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥

এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা। হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়াদা, দুনয়ন দ্বারয়ান দিয়েছি॥

মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি। তাই সর্ব্ব জ্বর হর লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি। মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥ ৭৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা। (১)
ওরে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥

বলগে যা তোর যম রাজারে, আমার মতন নিছে কটা। আমি যমের যম হইতে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥

প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা।

---

(১) ভটা—দূত।

কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিতে রাখবে কেটা ॥ ৭৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি।

তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥

পাপ পুণ্যের বিচার কারী, তোর যম হয় কালেক্টরি। আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি ॥

শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি। আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাস পূরি ॥

রাম প্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী। আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥ ৭৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।

তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়াছে ॥

ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে। ওরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে ॥

হিসাব বাকী থাকে যদি, দিব নারে তোদের কাছে। ওরে, রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে॥ শিব রাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পাট্টা দিয়াছে। রাম প্রসাদ বলে, সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥ ৭৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি॥

কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি। আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি। এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি। রাম-প্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥ ৮০॥

প্রাসাদী সুর—তাল একতালা।

ইথে কি আর আপদ আছে।
এই যে তারার জমী আমার দেহ॥

যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥

ধৈর্য্য খোটা, ধর্ম্ম বেড়া, এদেহের চৌদিক ঘেরেছে। এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥ দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হোতে বাহির হয়েছে। কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥ প্রেম ভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে। কালী কল্প-তরুবরে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥ * * ॥ ৮১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি। ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরাম প্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি। ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥ ৮২ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে ॥

আরক্ত বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাস্য কিবে। দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে॥

লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া। তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে॥

গালা গালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী। রাম-প্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমারে রে॥ ৮৩॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে॥

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান। ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥

যত শোন কর্ণ পোটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে। কালী, পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে। ওরে, আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে॥ ৮৪॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়॥

তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়। দুর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়॥

পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়। তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥

প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়। আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয়॥ ৮৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা।

জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে॥

আপনে ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে। তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা কোন পুরুষে॥

মাগীমিন্সে ঝগড়া করে, রোতে নার বাসে। মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে। মা গো, আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজে কৈলাসে॥৮৬॥

প্রসাদী সুর—তালএকতালা।

মা গো আমার কপাল দূষী।

দূষী বটে গো আনন্দ ময়ী॥

আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারানশী। নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥

অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি। আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি ॥

না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, * পাপ করেছি রাশি রাশি। আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥

জনমি ভারতভূমে, মা! কি কর্ম্ম করিলাম আসি। আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকুল পাথারে ভাসি ॥ †

শ্রীরাম প্রসাদে বলে, ভাবতে নারি দিবা নিশি। ওমা যখন শমন জোর করিবে দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥

পরের হরণ পরগমন, মনে তখন হাসি খুসি। সাজাই যখন, করে রোদন, প্রসাদ নয়ন জলে ভাসি ॥ ৮৭ ॥ পাঠান্তর ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে।

---

* জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বা গো (পাঠান্তর)।

† আমি না ভজিলাম অভয় পদ কোথা পাব গয়া কাশী। (পাঠান্তর)

তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে। যদি পারে যাবি, দুখ মিঠাবি, মনের গিরা দেরে কেটে ॥

বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে। ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কিকর্‌বে আর ভবের হাটে ॥

শ্রীরাম প্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে। ওরে, এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে ॥ ৮৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি কর্‌ব কৃষি।
ওগো, এ ভব সংসারে আসি ॥

তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী ॥

দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি। মা গো, যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥

হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি। তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশী ॥

কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি। আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি ॥

প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী। আমার মনের বাসনা তোমার, ও রাঙ্গা চরণে মিশি ॥ ৮৯ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

জয় কালী জয় কালী, বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেয়োনা রে ভোলা মন, ঘুমেতে হারারে ধন॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন্।
তখন আসিবে নিন্দ্, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন॥ * *॥ ৯০॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্বে ধারা॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে। তখন ধরাতলে পড়্ব লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ। ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥ *
শ্রীরাম প্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে। ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা॥ ৯১॥

---

* এই সঙ্গীতে স্পষ্টাক্ষরে প্রসাদের "তারা নিরাকারা" উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি ॥

অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি। যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥

অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি। যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি। যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি ॥

প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে* দূরে রইতে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥

---

* এস্থানে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিকে মনের দুই ভার্য্যা বলা হইয়াছে। কুপ্রবৃত্তি অর্থে কেবল "প্রবৃত্তি" মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুই ভার্য্যার মধ্যে প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিতে প্রথম পদে বলিয়াছেন। প্রথম ভার্য্যার পুত্র অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি প্রসূত যাহা কিছু হউক, তাহাকেই দূরে রাখিতে বলিয়াছেন।

প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি। তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর! মনের মতন্ মন হবি ॥ ৯২ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মা তোমারে বারে বারে, জানব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ নীরে, স্রোতের সেহলার মত ॥ * * ॥
দ্বিজরাম প্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে। দাঁড়াও একবার দ্বিজ (১) মন্দিরে, দেখে যাই জনমের মত ॥ ৯৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে ॥
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে ॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে। রব রসাভাষে, হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে স্থফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে। আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥

---

(১) দ্বিজ মন্দিরে—দ্বিজাত্মাতে।

মন কর কি, লওরে সুধা, দুজনাতে মিলে মিশে। খাবে একই নিশ্বাসে যেন, সূর্য্য তেজে সকল শোষে॥

রাম প্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠি, শুদ্ধ তারারেশে। মাগী জানে না যে মন কপাটে, খিল দিয়েছি বড় কসে ॥ ৯৪ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর ভুলালে ভুলব না গো।

আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব নাগো॥

বিষয়ে আশক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব নাগো। সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুণ তোলবো না গো॥

ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব না গো। আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুলব না গো ॥

মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো। রাম প্রসাদ বলে দুধ্ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব নাগো॥ ৯৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।

কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা। ওরে, জ্ঞান খড়্গে বলি দান, করিলে কৈবল্য পাবা॥

কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা। ওরে, মায়া সূত্র, ভেদ সূত্র, তারে দূরে হাকায়ে দেবা॥

আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা। রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা॥ ৯৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥

পরি হরি ধন মদ, ভজ পদ কোকনদ। কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ॥

কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম। অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥

রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়। মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥ ৯৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥

ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তী জেনেও কি তাই জান না ॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা। ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয়, আলো চাল আর বুট ভিজনা ॥

জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা, সাদরে তাই কি জান না। ওরে কেম্‌নে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা ॥ ৯৮।

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে; কালী ভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে।

শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু; দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প-গাছে।

গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী; শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে।

যোগী ইচ্ছা করে যোগ গৃহীর বাসনা ভোগ; মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে। *

আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়; অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক্ পাছে ॥ ৯৯ ॥

রাগিণী টুরি জায়েনপূরী—তাল একতালা।

সময় তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে।

কথা রবে, কথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে ॥

ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে। সাগরে যার বিছানা মা! শিশিরে তার কি করিবে ॥

দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে। কেবল ঐ দুর্গা নাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ * * ॥ ১০০ ॥

---

* এখানে 'থাকে' অর্থে, পদ্য মিলের অনুয়োধে, 'আছে' ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে। "ঘরে মুক্তি মূর্ত্তিমতী" ও "মার ইচ্ছা যোগ ভোগ ভক্ত জনে আছে"—এই দুই বাক্য দ্বারা প্রসাদ প্রকারান্তরে ইহাই বলিতেছেন যে ধর্ম্ম সাধনার জন্য তীর্থ পর্য্যটন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

রাগিণী টুরি জায়েনপুরী—তাল একতালা।

আমায় ছোওনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥

শোন্‌রে শমন বলি আমার জাতি কিসে গিয়াছে (ওরে শমন রে)। আমি ছিলেম্‌ গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী, আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥

মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমনরে)। ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥ ** ॥ ১০১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে॥

ভবজরা পাপ রোগ নীলাচলে নানা ভোগ। ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥

কালী নাম মহৌষধী ভক্তি ভাবে পান বিধি। ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম্য হবে॥

মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত। ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে॥

প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরু ছায়া। ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে॥ ১০২॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

এশরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালী নাম নাহি বলে॥

কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে। ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে॥

সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ। ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥

যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে। ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে॥

সে চরণে কায কি বা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা। ওরে কালী মূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে॥

ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার। রামপ্রসাদ বলে বাবই গাছে আম্র কি কখন ফলে॥ ১০৩॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল একতালা।

আয় দেখি মন তুমি আমি দুজনে বিরলেতে বসিরে॥
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে। পদে লুকাইব সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে॥
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে। গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করিরে॥
শ্রীরাম প্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলাসা করিরে। মধুপুরী যাব মধুখাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে॥ ১০৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজি।
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজি। সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাঁজি॥
অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী। তুমি ঠেকবে যখন শেখবে তখন কর্ব্বে কালে পাপোষ বাজি॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি। পড়ে

চেরের কোটায় মন টুটায় যে ভজে সে মত্ত গাঁজি (১) ॥
কুতুহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আস্‌বে হাজী। যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥ ১০৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে ভাল বাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে ॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে ॥
ধনে জনে আশা বৃথা বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা। তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথা কারে ॥
সংসার কেবল কাচ কুহকে নাচায় নাচ। মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ অনুকূলে অনুরাগ। দেহ রাজ্য

---

(১) বৃদ্ধ কালে ঈশ্বর ভজনা করিবে অনেকের এই মত দেখা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদ বলিতেছেনঃ—
"চেরের কোটায়" অর্থাৎ কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবনের চতুর্থ বা শেষ অংশে "টুটায়"—অভাবে পড়ে যে ভজনা করিতে চায় সে মত্ত গাঁজাখোর।

দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥

যা করেছ চারা কিবা প্রায় অবসান দিবা। মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে ॥

প্রসাদ বলে দুর্গানাম সুধাময় মোক্ষধাম। জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥ ১০৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে।

হ্যাদে গো জননী শিবে ॥

তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে ॥

থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে। যদি অভয় পদে মন থাকে তো কায কি আমার ভবে ॥

বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে। একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥

আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে। আমি ডুব-দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে ॥

গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে। আছি কাঠের মুরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে (১) ॥

১। স্বদেশ-প্রিয় ব্যক্তি দেশান্তর বাস সময়ে মাকে পাইলে যেমন স্বভাবতঃই বলিতে পারে যে—"এই তো আমি

প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি তো মা রবে। তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে ॥ ১০৭ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলী ॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটী কভু নাহি ভূলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥
শ্রীরাম প্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে। আমি শরণ নিলাম চরণ তলে; অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥ ১০৮ ॥

বাড়ী যাইতেছি, আর কি আমায় দেশান্তরে দেখিতে পাবে?" "আমার শরীর মাত্র এখানে আছে, কিন্তু মন বাড়ীতেই গিয়াছে।" ঠিক সেই ভাবে পরলোক সম্বন্ধে প্রসাদ বলিতেছেন—, গিয়েছি না যেতে আছি" ইত্যাদি।

পরলোকে তাঁহার কেমন জীবন্ত বিশ্বাস ছিল, এবং কেমন আনন্দের সহিত তিনি পরত্র গমনে প্রস্তুত ছিলেন, এই সঙ্গীতে তাহাই প্রকটিত রহিয়াছে।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা ॥

মন জান নাকি ঘটবে লেঠা।

যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা। ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা ॥

পিঞ্জরে পোষেছ পাখী, আটক করবে কেটা। ওরে জান না যে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছে নটা ॥

পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা। তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা ॥

প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা। আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ি, বুঝাইব সেটা ॥ ১০৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় [illegible] ধন দিবি তোর কি ধন আছে।

তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে ॥

ওচরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে। এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥

যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে। ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥

বাপের ধনে বেটার সত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে! রাম
প্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী করেছে॥ ১১০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কাজ কি মা সামান্য ধনে॥
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে। যদি
দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥

গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে॥

প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে। আমি
অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে, স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥১১১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।

যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে॥

হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপোটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥

সওয়াল জবাব কর্ব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য, বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥ ১১২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।

বড় নিশ্চিন্তে রয়েছ তোমার পতিত তনয় ডুবল ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা ভবে। মা
তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে স্মরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে। মা তোর
কাশী মোক্ষ ধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে নাম নাহি লবে॥১১৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি দেখরে ভেবে।

ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে॥
ভব ঘোরে হয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানী ভবে। সদা ভাব
সেই ভবানী পদ যদি ভব পারে যাবে॥ ** ॥ ১১৪॥

রাগিণী খটভৈরবী—তাল পোস্ত।

জানিগো জানিগো তারা তোমার্ যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা।
কেহ যায় মা পালকী চড়ে কেহ তারে কাঁদে করে। কেহ শালের দেয় দুশালা কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥ **॥১১৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা॥

জয় কালী জয়কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে, পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ-দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥ **॥ ১১৬॥

রাগিণা ললিত বিভাষ—তাল আড়খেমটা।

কালীর নামে গণ্ডী (১) দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
শুনরে শমন তোরে কই, আমিতো আটাসে নই, তোর কথা কেন রব সয়ে। ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে হুলকো দিয়ে॥

---

(১) গণ্ডী—মণ্ডল। সীমা ব্যঞ্জক গোলাকার রেখা।

কটু বলবি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে। সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥

শ্রীরামপ্রসাদে ভনে, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে। আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে ॥ ১১৭ ॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।

যাঁর কৃতকাশী, তত্বরসী বিগলিতকেশী ॥

যেই জগম্বার কুণ্ডল, পড়ে ছিল খসি। সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি ॥

অসি (১) বরুণার (২) মধ্যে তীর্থ বারাণসী। মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসীধারা অসি ॥

কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ব মসী। ওরে তত্ত্বমসীর উপরে সেই মহেশ মহিষী ॥

রাম প্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি। ঐযে গলাতে বেঁধেছ আমার কালী নামের ফাঁশি ॥ ১১৮ ॥

---

(১) অসি—কাশীর দক্ষিণস্থ নদী বিশেষ।

(২) বরুণা—কাশীর উত্তরস্থ নদী বিশেষ।

এই অসি ও বরুণার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বারাণসী বলে।

প্রসাদী স্বর—তাল একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি।

(ভব সংসারে বাজারের মাঝে)

ঐযে মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥

কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি। ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥

বিষয়ে মেজেছে মাঁজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি। ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুঁড়ি যাবে উড়ি। ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥ ১১৯॥

প্রসাদী স্বর—তাল একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।

মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা॥

স্বগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা। মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥

প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা। যখন জোয়ার আসবে ওজায়ে যাবে, ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা॥ ১২০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সে কি স্বধু শিবের সতী।

যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥

ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি। সে যে সর্ব্ব-দলের দল-পতি, সহস্রদলে করে স্থিতি ॥

নেঙ্গটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি। ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে নাথি ॥

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি। ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধ মতি ॥ ১২১ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।

ভবে আমার কি হইবে গো মা ॥

অগম্য জলেতে মিনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছ ভুবন ময়। ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে ॥

পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে। রাম প্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে ॥ ১২২ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি।

ঐযে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি॥

মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি। আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি॥

কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি। যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়া-ইতাম তোমারি॥

য়শঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি। ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী॥

প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁকঠারি। ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥ ১২৩॥

প্রসাদি সুর—তাল একতালা।

শমন আশার পথ ঘুচেছে।

আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥

ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে॥

এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রর্জ্জুতে বাঁধা আছে॥ সহস্র দলকমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে॥

দ্বারে আচে শক্তি বাঁধা চৌকিদারী ভার লয়েছে। সে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥

মূলাধারে স্বাধিষ্টানে কণ্ঠমূলে ভূরু মাঝে। এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে।

রাম প্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্র সূর্য্য উয়দ আছে। ওরে তমো নাশ করি তারা হৃদমন্দিরে বিরাজিছে॥ ১২৪॥

প্রসাদি সুর—তাল একতালা।

ভাব কি? ভেবে পরাণ গেল।

যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কেন কালরূপ হল॥

কাল বড় অনেক আছে এবড় আশ্চর্য্য কালো। যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পয়ে হৃদয় পদ্ম করে আলো॥

রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো। ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো॥

প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল। না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥ ১২৫॥

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥

আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব। আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি, আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)॥

সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব। কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে এ কথা কাহারে কব, (মা তারা॥

প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া, নাম কি আছে যে আর তা লব। তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী, নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা)॥ ১২৬॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করাল বদনা। নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা॥

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না। সদা পদ্ম বনে হংসী রূপে, আনন্দ রসে মগনা॥

আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা। জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥

প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না ॥ ১২৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা ॥
সৌভাগ্য কররে দূরে মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা। রাম প্রসাদ
বলে তবেই সে মন, ভব রোগে মুক্ত হবা ॥ ১২৮ ॥

রাগিণী জংলা তাল একতালা।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে। সে যে অনন্ত
ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে। দেবের
দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লোটায়ে ॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে। শুম্ভ নিশুম্ভকে
বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥ ১২৯ ॥

রাগিণী ললিত খাম্বাজ—তাল একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন বদন ভরে মাকে ডাকিরে। আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখিরে॥

লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা [illegible]রে। তবে তারা নামের কবচ মালা বৃথা আমি গলায় রাখিরে॥

মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা। আমি কখন নাতান, কখন সাতান, কখন বাকীর দায়ে না ঠেকিরে॥

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে। যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব আমি অন্ত পাব কিরে॥ ১৩০॥

রাগিণী গাড়া ভৈরবী তাল জৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে॥

দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে। আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

যার জন্যে মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে। সেই প্রিয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে। তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে কি করিতে পারবে কালে॥ ১৩১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।

তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যাম্মা মা মোর হেমের ঘড়া
তুই কাঁচ মূলে কাঞ্চন বিকালি ছিছি মন তোর কপাল পোড়া।
কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া। মিছে
এদেশ সেদেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধররে মন্ত্র সোঁঢ়া॥ *
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন পাঁচশোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি, তোমায় করবে তোলা পাড়া॥ ১৩২॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

যদি ডুবল না, ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে। মন হালি ছেড়না ভরসা বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে॥
মন! চক্ষু দাড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে। ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজি করের মেয়ে॥

---

* সোঢ়া মন্ত্র—মন্ত্র বিশেষ। যাহার দ্বারা ভয় বিনাশ হয়।

মন! শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে। রাম প্রসাদ বলে কালী নামের যাওরে সারি গেয়ে॥ ১৩৩॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।

গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী (১) হলো কাল॥

আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুঃখ; মাসীর মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা, দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল॥ * *॥

দ্বিজরাম প্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃ কুলে না করিলাম বাস; পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হইল কালা, ভোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল॥ ১৩৪॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল জৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী; আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি।

---

(১) মাসী—অবিদ্যা।

নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দি মা; আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।

নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা; জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি।

বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা; আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥ ১৩৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখেরে, যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে ॥

যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশান্ বাসী; ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে, না পায় ভাবিয়া রে ॥

ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে; তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে।

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি; দ্বিজ রাম প্রসাদের নতি, চরণতলে রেখ রে ॥ ১৩৬ ॥

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

জগত জননী তরাও গো তারা। জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে, আমি কি জগত ছাড়া গো তারা ॥

দিবা অবসানে রজনী কালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে; মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী, তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥ * * ॥

দ্বিজ রাম প্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া; কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম্ম শিখিলে, মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥ ১৩৭ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী; আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥

কালী নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে মন; ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হইলে সুখী ॥

শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন; ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল রে দেখি ॥**॥ ১৩৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্ত কেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥

কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী। তারা কতদিনে কাটবে আমার, এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥

প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদি গে কাশীবাসী। ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে, পিতা হলেন শ্মশান বাসী ॥ ১৩৯ ॥

প্রসাদীসুর—তাল এঁক তালা।

আমি নই পলাতক আসামি। ওমা, কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ॥

বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি। আমি মহা মন্ত্র মোহর করা, কবচ রাখি শাল তামামি ॥

আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে জমি।

* * * * ॥

প্রসাদ বলে খাজনা বাকী, নাইকো রাখি কড়া কমি। যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধু মাঝে, ডুবেও পদে হব হামি* ॥১৪০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন তোরে তাই বলি বলি।

এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥

প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি। ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি ॥

---

* হামি—দাবীদার।

গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি। ওরে খাও-য়ালি কেবল মাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥

যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দিলি মিজাজ আলি। এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালী ॥

প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি। ওরে জান না কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥ ১৪১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তাই কালোরূপ ভাল বাসি।
জগ মন্মোহিনী মা এলোকেশী ॥

কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি। যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তার হৃদয় বাসী ॥

কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী। হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥

যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী। ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমে শশী ॥

প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামিশি। ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করো না দ্বেষাদ্বেষী ॥১৪২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা ॥

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ॥

ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি। তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে, সত্বগুণে মন দিয়েছি ॥

তারা নাম সারাৎসার, আত্ম শিক্ষায় বাঁধিয়াছি। সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা নামের কাছ করেছি ॥

প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি। লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি ॥ ১৪৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥

যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা। ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥

অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা। এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা ॥

রাম প্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা। ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন, ছজনেতে কল্লে সারা ॥১৪৪॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।

সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥

রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাব্‌লেম না কি হবে পাছে। ঐ যে চিত্র গুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥

জন্ম জন্মান্তরের * যত, বকেয়া বাকী জের টেনেছে। যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল, কর্ম্মলের ফল ফলেছে॥

জমায় কমি খরচ বেশী, তরব কিসে রাজার কাছে। ঐ যে রাম প্রসাদের মনের মধ্যে, কেবল কালী নাম ভরসা আছে॥১৪৫॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

আমি কবে কাশিবাশী হব॥

সেই আনন্দ কাননে গিয়ে, নিরান্দ নিবারিব॥

গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব। ঐ বারাণশীর জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব॥

---

* রামপ্রসাদ প্রথম অবস্থায় জড়োপাসক ছিলেন এবং পূর্ব্ব ও পর জন্ম মানিতেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁহারই পরবর্ত্তী অন্যান্য গান দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে তিনি পর জন্ম হইবে না জানিতে পারিয়াছিলেন। আমরাও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছি।

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব। আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে, নৃত্য করে গাল বাজাব ॥ * * ॥ ১৪৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ ॥

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন, সুখে নাচ॥ রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি, সোনার দরে তা কিনেছ। ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক, মাটীর দরে তাই বেচেছ ॥

সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছে। যখন সে রূপে বিরূপ হইবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥**॥ ১৪৭॥

প্রসাদি সুর—তাল একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরী কারণ জলে ॥

বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভব নদীর জলে। ওরে, কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেহ কেহবা হারালো মূলে ॥

ক্ষিত্যপ তেজ, মরুৎ ব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে। ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥

পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে, পাঁচে মিলে।

যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ১৪৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব।

ও তুই শকার বকার বল্‌তে পারিস্, বলতে নারিস দুর্গা শিব ॥

খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা। ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥

পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব। ওরে চুরি দারি করিলে পরে, উচিৎ মত সাজাই পাব ॥ * * ॥১৪৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কালী কালী বল রসনা রে।

ও মন ষট চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥

তিনটে কাছি কাছা কাছি, যুক্ত বাঁধা মুলাধারে। পাঁচ ক্ষমতায়, সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে ॥

যুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে। সে যে সময়-সির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে। ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥

পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে। ও মন, এইত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার হৃ অক্ষরে॥ ১৫০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥

আমি ভাবি এক, হয় আর সুখ নাই মা কদাচিত॥

পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত। ও মা ষড়-রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত॥

আসিয়া ভব সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত। ও মা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয়গো মনের মত॥

চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচলোনা সে মুখের তিত। কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত॥১৫১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা॥

এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না। তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না॥

আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না। আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে, তায় কাচ না॥

খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না। আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না॥

অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পুরে না। তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবে না॥ ১৫২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।

গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়॥

স্বপ্নে যা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়। ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥

রাজ রাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়। ওকে গরুড় বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়॥

প্রসাদ ভনে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়। তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা, পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥ ১৫৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।

আমি কালী নামে গণ্ডী দিয়ে ॥

কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে। মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণ ভয়ে ॥**॥১৫৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।

এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে ॥

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে। যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে ॥

জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা কি অপরে। রাম প্রসাদ বলে বলব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে ॥ ১৫৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার খেলান হলো।

খেলা হলো গো আনন্দময়ী ॥

ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা। এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা; কাল যে নিকটে এলো ॥

বাল্য কালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো। পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধ কালে, অশক্তি কি করি বল। ওমা, শক্তি-রূপা ভক্তি দিয়া, মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥ ১৫৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেম্নি নাচে ॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে। ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে। ওমা তুমি দুঃখ তুমিই সুখ, চণ্ডিতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সুত্র, সে সুতার কাটনা কেটেছে। ওমা, মায়া সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥ ১৫৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর তোমায় না ডাকব কালী।
তুমি মেয়ে হয়ে অসী ধরে, লেংটা হয়ে রণ করিলি ॥

দিয়া ছিলে একটা বৃত্তি, তাওতো দিয়ে হরে নিলি। ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খালি॥

দীন রাম প্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি। ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি॥ ১৫৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥

জীর্ণ তরী তোফান ভারী, বাইতে নারি, ভয়ে মরি। ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি॥

এনে ছিলে, বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোঁয়ালি। যখন হিসাব করে দিতে হবে মন, তখন তহবিল হবে হারি॥

দীন রাম প্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী। তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় রে চুরি॥ ১৫৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে॥

মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে। ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে, যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥

পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক ঠিকানা করে। রাম প্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে॥ ১৬০॥

প্রাসাদী সুর—তাল একতালা।

কেরে বামা কার কামিনী।
বসে কমলে ঐ একাকিনী॥

বামা হাসচে বদনে, নয়ন কোণে, নির্গত হয় সৌদামিনী॥

এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি। গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, শোড়ষ নবযৌবনী॥ * *॥ ১৬১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে তোর চরণ ধরি।

কালী বলে ডাকরে, ওরে ও মন, তিনি ভব পারের তরী॥

কালী নামটা বড় মিঠা, বলরে দিবা সর্ব্বরী। ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি॥

দ্বিজ রাম প্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরী। তিনি তনয় বলে দয়া করে, তরাবেন এ ভব বারি॥ ১৬২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের চরণ তলে স্থান লব।

আমি অসময়ে কোথা যাব॥

ঘরে যায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো। মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥

প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব। আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥১৬৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এলোকেশী দিগ্বসনা।

কালী পূরাও মোর মনবাসনা॥

যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি। আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দেমা ঠিক ঠিকানা॥

যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে। এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে, এ বাসনা কেহ জানে না॥ * * ॥১৬৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মরি গো এই মন দুঃখে।

ওমা মা বিনে দুঃখ বলব কাকে॥

একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে। ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥

সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে যারে পরম সুখে। ওমা, আমি কত অপরাধী, লুন মেলে না আমার শাকে ॥

ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, পাছাড় মারিলে আমার বুকে। ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে ॥ ১৬৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পূরল নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে ॥

দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবে ভরসা। আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্ম নাশা ॥

শ্রীরাম প্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনে দিশা। আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে, ঘটল আমর উলটা দশা ॥ ১৬৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

থাকি এক খান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥

হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে। ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥ ** ॥ ১৬৭ ॥

প্রসাদীসুর—তাল একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে ॥

ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ শাস্ত্রে নাইকো সীমা। তারার মহিমা আপনি মাত্র, জেনেছেন শিব শঙ্করে ॥

আমার মায়ের নাম গান করি, কত পাপী গেল তরে। ওমা কৈলাস গিরি দিব্য পূরী, দেখাও এবার মা আমারে ॥ ** ॥ ১৬৮ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

মা বলে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই; থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।

গিয়ে বিমাতার (১) তীরে, কুশ পুত্তল দাহন করে; ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥ ** ॥ ১৬৯ ॥

(১) বিমাতা—গঙ্গা।

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল; (গ্রহণে কালীর নাম)। তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল॥

একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়। কালী নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল॥

কাল ভাবি চক্ষু মোদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি। শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নির্ম্মল॥

আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু; গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল॥

প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই; বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল॥ ১৭০॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

জননি! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে, তারিণী। তপন তনয় ভয় চয় বারিণী॥

প্রণব রূপিনী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী। সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীন মূলা, মূলাধার অমল কমল বাসিনী॥

আগম নিগমাতীতাখিল মাতাখিল পিতা, পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী। হংস রূপে সর্ব্ব ভূতে, বিহরসি শৈলস্মুতে, উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী॥

সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্য ধাম, অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী। তাপত্রয়ে সদাভজে, হলাহল কূপে মজে, ভনে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি॥ ১৭১॥

রাগিণী মুলতানী—তাল একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দ কাননে।

বট মনোময়ী শান্তনা কেন, কর না এই মনে॥

শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী, তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে। অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর, নখ জালে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার সনে॥

দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা, হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে। প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত, কিবা কাজ অভিযুক্ত, পুরী গমনে॥ ১৭২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কালী গো কেন লেংটা ফির।

ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥

বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর। মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর॥

আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মসানে চর। মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥ **॥ ১৭৩॥

রাগিণী সিন্ধুকাফী—তাল একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে॥

পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে। পরের জামিন হইলে পরে, সে না দিলে আপনে ভরে॥

যখন দিনে নিরাই করে, শিকারী সব রয় না ঘরে। জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে॥

চাসা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে। যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে॥ **॥ ১৭৪॥

রাগিণী মূলতানী ধানেশ্রী—তাল একতালা।

করুণা ময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ॥

কারে দিলে ধন জন মা! হস্তী অশ্ব রথ চয়। ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই ॥

কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই। মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই ॥

দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই। ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥ ১৭৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা ॥

ঐ যে মন করিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছটা বাদী ॥

অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি। যদি তুমি আমি এক হইতো, পুর হতে দূর করে দি ॥

বিমাতা মরেণ শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি। সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই ভব নদী ॥

হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী দাদী *। এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি ॥

---

* দাদী——আসামী।

মাতা আদ্যা, মহা বিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি। ওমা, তোমার পুতে, সতিন্ সুতে, জোর করে, কার কাছে কাঁদি॥

প্রসাদ ভনে, ভরসা মনে, বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥ ১৭৮॥

প্রসাদীস্থর—তাল একতালা।

পতিত পাবনী পরা,

পরামৃত ফলদায়িনী।

সুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া। কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তার কারিণী॥

কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য। তারারূপে তারয় মাং, নিখিল জননী॥

ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব। প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী॥ ১৭৭॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

অপরা জন্মহরা জননী।

অপারে ভব সংসারে এক তরণী॥

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব। উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী॥

মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া। দিন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥

আনন্দ কাননে ধাম, ফলকি তারিণী নাম। যদি জপে দেহ অন্তে, শিব বলে মানি ॥

কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন। নিজ গুণে তিনলোক, তারয় তারিণী ॥ ১৭৮ ॥

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে ॥

পৃথক প্রণব নানা লীলাতব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী। পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচে ছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে

বিচারি। মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি ॥ ১৭৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডাকরে মন কালী বলে।

আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলনা মন সময় কালে ॥

এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ। ওরে ওপদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে ॥

বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে। ওরে পারবে না ছাড়াইয়ে যাইতে, কাল ফাঁসি লাগবে গলে ॥

দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, কালের বশে কাজ হারালে। ওরে এখন যদি না ভজিলে, আমসী খাবে আম ফুরালে ॥ ১৮০ ॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা।

তোমার সাথী কেরে, ওমন।

তুমি কার আশায় বসেছ রে মন ॥

তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে। যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে ॥

প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে। নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁত, যোগে লেগেছে রে ॥ ১৮১ ॥

প্রসাদী সঙ্গীত।

(সময় বিষয়ক)

কামিনী যামিনী বরণে রণে, এল কে। উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লাসিতা দানব নিধনে।

পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি; তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।

দ্বিজ রাম প্রসাদে কয়, তবে আর কিরে ভয়; আনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে॥ ১৮২॥

রাগিণী বেহাগ তাল একতালা।

ও কেরে মন মোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী॥

ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা। একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী॥

সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয় নয়নী। শশী খণ্ড শিরোসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাকিনী॥

ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে, বেসরে মণি। মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধা রস কূপ, বদনখানি॥

শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশ পাশ, কাদম্বিনী। বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি ॥

কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি। সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ীরে, করুণাময়ীরে, বল জননী ॥ ১৮৩ ॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল ঠুংরি।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।

কেরে, নব নীল জলধর কায় হায় হায়, কেরে, হর হৃদি হ্রদ পদে দিগবাসে ॥

কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল, পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরনী ; হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম ডোরে, রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে।

কেরে নিন্দিত রাম কদলীতরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ; অতি রোষ বলে, ভূজঙ্গম দলে, নাভি পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এঁসে।

কেরে উন্নত কুচ কলি, মুখ শতদলে অলি, গুণ্ গুণ্ করিয়া

বেড়ায়, যেন বিকশিত সিতাম্ভোজ বনরোহায় ১; কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা, যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে।

কেরে, কুন্তল জাল আবৃত মুখ মণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরুধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা; অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, শিতি মৃদু দোলে, কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।

কত হুহুঙ্কবা হুঙ্কবী, নাচিছে ভৈরবী, হিহি হিহি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি; রামপ্রসাদ ভনে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে, যাঁর পদতলে শব ছলে আশুতোষে ॥ ১৮৪ ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে, বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব দলে, ধরি করতলে, গজ গরাসে ॥

কেরে, কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে। কেরে নীল কমল, শ্রীমুখ মণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥

কেরে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত, নখর নিকর, তিমির নাশে;

১ বনরোহ—জলরোহ অর্থাৎ মৃণাল। বন—জল।

কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে, উঠে আকাশে।

দীতিসুত চয়, সবার হৃদয়, থর থর থর, কাঁপে হুতাশে। মাগো! কোপ কর দূর, চল নিজ পুর, নিবেদে শ্রীরাম প্রসাদ দাসে॥ ১৮৫॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

মা! কত নাচ গো রণে।

নিরুপম-বেশ বিগলিত-কেশ, বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে।

সদ্য-হত দীতি-তনয়-মস্তক-হার লম্বিত সুজঘনে। কত রাজিত কটীতটে, নর কর নিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে॥

অধর সুললনিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকশিত, সুদশনে। শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে।

সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে। প্রসাদ প্রবদতি,মম মানস নৃত্যতি,রূপ কি ধরে নয়নে॥১৮৬॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নর কর কটীতটে, হরে বিহরে রূপসী। সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী॥

শব শিশু ইষু, শ্রুতি তলে শোভে, বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি॥

সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃভাষা, সুরেশানুকুলা ষোড়শী॥

প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া! ভবার্ণব ভয় বাসি। জন্মর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা, চরণে গয়া গঙ্গা কাশী॥ ১৮৭॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

এলো চিকুর ভার, এবামা! মার মার মার রবে ধায়॥

রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি, রতি পতি মতি মোহ পায়। অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী, নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়॥ সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায়॥

কাল বলে এত কাল, এড়ালেম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায়। টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল, শিব পুজার এই ফল, অশিব ঘটায়॥ অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥

ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব, কার ভরসায় রব, হায়। চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী, নিতান্ত করুণা-

ময়ী, স্থান দিবে পায়॥ স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এ জন্ম কর্ম্মসায়॥

প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে, এ শঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়। মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়, দক্ষিণাতে মন লয়, কর দৈত্য রায়। ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কাজ আশায়॥ ১৮৮॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

নব নীল নীরদ তনু রুচি কে? ঐ মনোমোহিনী রে॥

তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ। কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখ মণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ॥

অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি* গলিত কুন্তল পাশ। গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস॥

বামার বাম করপর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ। শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস॥

ভনে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে, করুণাবলোকনে, কলুষ চয় কর নাশ। তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে, প্রভবে এ কথা আভাষ॥ ১৮৯॥

---

* কিশোর বিধি অরি—কুণপ শিশু। অসুর।

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল জলদ তেতালা।

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।

কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভুবন মোহিতা, একি অনুচিতা, কুলের কামিনী। কুঞ্জরবর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ, সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজ দলনী॥

কেরে নব নীল কমল কলিকা বলি, অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি, মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত, পূর্ণ শশধর বলি। ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল, ও কেহ চাঁদ, দোহে দোহ করতহি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি॥

কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু নিন্দিত, রুধির অধীর বহিছে, তদূর্দ্ধে কটীবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিনী সহ শোভা করিছে। করতল স্থল, নিরমল অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়, খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিণী॥

কেরেউর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করীকুম্ভ ভয়ে বিদরে, অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে। প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে,

রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে, দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী ॥ ১৯০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে। সঙ্গিনী রঙ্গিনী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥

কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে। ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে ॥

ঢলিয়া, ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধররে বলিয়া, ঘন হাসে। কাহার নারীরে, চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে, ছিন্ন বেশে ॥

কারে আর ভজরে, ওপদে মজরে, রূপে আলো করিছে, দিগ দশে। কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে, প্রসাদ ভনেরে, চল কৈলাসে ॥ ১৯১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা।

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ।
বসন বিহীনা কেরে সমরে ॥

মদন মথন উরসী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে। প্রলয়

কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে, জন মনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥

শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা, ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে। কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে, সম্বর বেশ, কুরু কৃপা লেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥ ১৯২॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কাম রিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয় দল তনু শ্যামা॥
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমর নিপুণা গুণ-ধামা। কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার, যমজয়ী বাজাইয়া দামা॥ ১৯৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা।

ঢল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ॥
নখরাজী উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।

একি! চতুরানন হরি, কলয়তি (১) শঙ্করী! সম্বরণ কর রণ ॥

মগনা রণ মদে, সচলা ধরা পদে, চরণে অচল চালন। ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ ॥

প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্ত মে মত্ত বারণ। সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ ॥ ১৯৪ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমা তেতালা।

মরি! ওরমণী কি রণ করে!

রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ ভরে, রথ রথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে। কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল, দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥

আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে (২) পতঙ্গ (৩) প্রায়, মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে। নিরুপমা রূপ ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা,* প্রবল দনুজ ঘটা, গেলে গরাসে ॥

ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল, মরি কিবা

---

(১) কলয়তি—বলিতেছি। (২) পতঙ্গ—অগ্নি।

* কটা—কটাহ। ব্রহ্মাণ্ড। (৩) পতঙ্গ—ফড়িঙ্।

সুরসাল, গান বিভাসে। নিকটে বিবুধ-বধূ, (১) যতনে যোগায় মধু, (২) দোলায়ে বদন বিধূ, মৃদু মৃদু হাসে॥

সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা, জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে। ভনে রাম প্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার, আনন্দে বাজায়ে দামা, চল কৈলাসে॥ ১৯৫॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমা তেতালা।

অকলঙ্ক শশী—মুখী, সুধাপানে সদা সুখী, তনু (৩) তনু (৪) নিরখি, অতনু (৫) চমকে। না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ, পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥

শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুর ধারা, প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো করেছে। চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর, বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে॥

রামা অগ্র গণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা, কিবা অন্বেষণে

---

(১) বিবুধবধু—দেবী। ডাকিনী যোগিনী।

(২) মধু—সুরা, মদিরা।

(৩) তনু—ক্ষীণ, কৃশ। (৪) তনু—দেহ, কায়।

(৫) অতনু—তনু নাই যার। কাম, কন্দর্প।

রণে এসেছে। সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখ কুলা দন্ত মুলা আলো চুলা গায় ধুলা, ভয় করে হে॥

কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে, যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে। তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা, তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥ ১৯৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমা তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।

বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়া-গতা, শবে॥

গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে, অতনু সতনু জনু (১) অনুভবে। রবিসুতা (২) মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি, ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥

অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে, অনলে অনল গিলে, অনল নিভে। কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি, নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে॥ ১৯৭॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

মোহিনী আশা বানা, ঘোর তমনাশা বামা কে?

ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা, ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে। রূপসী

(১) জনু—জন্ম, উৎপত্তি। (২) রবিসুতা—যমুনা।

শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী, মুখ ঝালা, সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে ॥

দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহু বলে দৈত্য দলে, ডাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশী করেছে। ক্ষীণ দীন ভাগ্য হীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন, রামপ্রসাদে কালীর বাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ ১৯৮ ॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

সদাশিব শবে আরোহিনী কামিনী ॥

শোভিত শোণিত ধারা, মেঘে সৌদামিনী। একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব, মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী ॥

রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী, পদনখে শশী রাশি গজগামিনী। শ্রীকবিরঞ্জন ভনে, কাদম্বিনী রূপ মনে, ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস রজনী ॥ ১৯৯ ॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

এলো কেশে, কে শবে, এলোরে বামা। নখর নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা ॥

নব নব সঙ্গিনী, নব রস রঙ্গিনী, হাসত ভাবত নাচত বামা। কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হত-রিপু সমা॥

ভৈরব ভূত, প্রমথ গণ,(১) ঘন রবে, রণ জয়ী শ্যামা। করে করে ধরে তাল, ববম বম্ বাজে গাল, ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা॥

ভব ভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মৃঞ্চতি করম স্থনামা। তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥ ২০০॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

শ্যামা বামা কে?

তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-স্থধাকর-মণ্ডল-বদনী রে? কুন্তল বিগ-লিত, শোণিত শোভিত, তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে॥

বিপরীত একি কায, লাজ ছেড়েছে দূরে, ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পূরে। মম দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥

প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যু রূপিনী, ঐ কামরিপু পদে, এ

---

(১) প্রমথ—শিবের পারিষদ।

কেমন কামিনী। লঙ্ঘে গগণ ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতি চকিতে নয়ন পলকে ॥

ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেঁতু। কলয়তি কবিরাম প্রসাদ কবিরঞ্জন, কুরু কৃপা লেশ, জননী কালীকে। ২০১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট।

চিকণ কাল রূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে। অরুণ (১) কমল দল, বিমল চরণ তল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে।

বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে, ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে। ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল, লঘু গতি পতিত যুবতী অধরে ॥

সহজে নবিনা ক্ষীণা, মোহিনী বসন হীনা, কি কঠিনা দয়া না করে। চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণ-হর, বরসিত শর খর, কত কত শত শত রে ॥

কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবিয়া নয়ন ঝরে। ওপদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক (২) মানস আশ ধরে ॥ ২০২ ॥

---

(১) অরুণ—ঈষদ্রক্ত বর্ণ, লাল।

(২) মামক—মদীয়। আমার।

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।

সমর করে ওকে রমণী।

কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী॥

ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু, বামেতর তরণি (১)।
মরকত মুকুর (২) বিমল মুখ মণ্ডল, নূতন জলধর বরণী॥

শব শিব শিরে মন্দাকিনী রাজত, ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ, সুচারু নখর নিকর, সুধা ধামিনী॥

কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণাং কুরু হর-মোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবন, ধন, জননী॥২০৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট।

কে হর হৃদি বিহরে।

তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে॥

---

(১)। তরণি—সূর্য্য। সমর বিষয়ক সঙ্গীতে কালীর ত্রিনয়ন সঙ্গে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির উপমা পুনঃ পুনঃ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে কোন চক্ষুকে কার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট আছে। ললাটনয়ন—অগ্নি। বাম নয়ন—চন্দ্র। দক্ষিণ নয়ন—সূর্য্য॥

(২) মরকত—হরিদ্বর্ণ মণি বিশেষ। মুকুর—দর্পণ।

নীল কমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল (১) শোভে শরীরে। মরকত মুকুরে, মঞ্জু (২) মুকুতাফল, রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে ॥

গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাঁপল (৩) দশ দিশি তিমিরে। গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে ॥

ঘোর বিষয়ে মজি, কালী পদ না ভজি, সুধা ত্যজিয়া বিষ পান করিরে। ভনে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানবদেহ ধরি রে ॥ ২০৪ ॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখসুন্দর, তনুরুচি বিজিত, তরুণ তমাল ॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগনি সারিগম, গণ গণ গণ, মবরব যন্ত্র মণ্ডন ভাল।
তা তা থেই থেই, দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি, ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥

---

(১) শ্রম জল—ঘর্ম্ম।

(২) মঞ্জু—মনোহর। (৩) ঝাঁপল—ঢাকিল।

প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি! রক্ষ মম পরকাল।
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ, বারয় * কাল করাল ॥২০৫॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥

তনু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারা নিকর, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে ॥

বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি, কালরূপে তম রাশি রাশি নাশিছে। কহে কবি রামপ্রসাদে, কালীকা কমল পদে, মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে ॥ ২০৬ ॥

রাগিণী ললিত--তাল তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজ দলনা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥

ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ। ভূত পিশাচ প্রথম সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে, সঙ্গিনী বড় রঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ ॥

---

* বারয়— নিবারণ কর।

গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস, দ্রুত চলত চলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ। কহিছে প্রসাদ ভুবন পালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে, ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ২৮৭ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।

বিহরে বামা স্মর হরে।

সুরী কি অসুরী, কি নাগী (১) কি পন্নগী,(২) কি মানুষী ॥

নাসে মুকুতা ফল বিলোর, (৩) পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর, সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি। একি করে! করে করী ধরে রণে পশি, তনুক্ষীণা সুনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী ॥

নীল কমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য, লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী। কত ছলা কত কলা, (৪) এ প্রবলা চিত্তে বাসি, রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥

* *, * *, দিতী সুতচয়, সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি।

---

(১)নাগী—হস্তিনী। (২)পন্নগী—সর্পী।

(৩)বিলোর—লম্বিত। (৪) ছলা, কলা—ছলনা, কপটতা।

এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি, মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, একি সর্ব্বনাশী ॥

কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ, হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী। ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে, তুচ্ছবাসি, কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥ ২০৮ ॥

রাগিণী ছায়নাট—তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী ?

কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী। সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শরদ ইন্দু, কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধু-তনয়, এতিন নয়নী ॥

আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী। ফণী ফণাভরণ (১) জিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী ॥

কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণে ভ্রাজ। না করে লাজ, কেমন কায, মম সমাজে তরুণী ॥

আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল একি বিশাল,

(১) ফলাভরণ—মণি।

ভাল ভাল কাল-দণ্ড ধারিণী। ক্ষীণ কটীপর, নৃকর নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিনী ॥

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বৃন্তে, (১) কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে। চরণোপান্তে, মনদুরন্তে, রাখ কৃতান্ত দলনী ॥

আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল, টল টল ধরণী। ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি ॥

প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ। কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ নাশিনী ॥২০৯॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী, পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী। তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালাকৃশা, সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি ॥

মরি কিবা অপরূপ, নিরথ দনুজ ভূপ, সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী। জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে, পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥

---

(১) বৃন্ত—চিহ্ন।

নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে, ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি। ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে, গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি॥

ভনে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার, চৈতন্য রূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী। যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা, আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী॥ ২১০॥

রাগিণী ললিত—তাল রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।

বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা, (১) বিবসনা শবাসনা মদালসা। ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতি তলে ব্রহ্মা বিধূ, মনুজ্ঞা মধূর মুখী, মধূর লালসা॥

সোম-মৌলি (২) প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্ম নাশা। হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরি হর ব্রহ্মারাধ্যা, হরি পরিবার সেই, যে জভে দিগ্বাসা॥ ২১১॥

---

(১) বরটা—রাজহংসী।—

(২) সোম-মৌলি—চন্দ্রশেখর। শিব।

আগমনী—সঙ্গীত।

রাগিণী মালশ্রী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।

এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে। মুখ-শশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি, ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে। গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥

পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে। বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিকারী, তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥

যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে। কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে, কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে, ভাসে মহা আনন্দ সাগরে। জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে, দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাশরে॥ ২১২॥

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণি! নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, নন্দিনী নিকটে তোমার গো। চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো॥

জয়া! কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার। তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥

রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার। নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো॥

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার। বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে, মা বলে একি কথা মার গো॥

রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, শান্তনা করে বার বার। দাস কবি রঞ্জনে, সকরুণে ভনে, এমন শুভ দিন আর কার গো॥ ২১৩॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জং।

গিরি! এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না। বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়। এবার মায় ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়। শিব শ্মসানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ ২১৪॥

বিজয়া—সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার। কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার। তব দেহ হে পাষাণ, এদেহে পাষাণ প্রাণ, এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার॥

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন, হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার। প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজ রাণী, প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥ ২১৫॥

ষট্‌চক্র বর্ণন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার মনে বাসনা জননি।

ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥

মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী। সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥

স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে, ষড়দলোপর বাসিনী। ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী॥

ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি বীজ ধারিণী। ড, ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥

অনাহতে ষট্‌ কোণে, দ্বিষড়দল বাসিনী। ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥

বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী। নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী সাকিনী॥

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্র যোনি। চন্দ্র বীজে সুধাক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥ ২১৬॥

ষট্ চক্র ভেদ।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে।
কুল কুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা॥

এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে, আর স্থান চিন্তামণি পুরে। শিব শক্তি সব্যে (১) বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে, সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥

ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা, এই ধ্যান করে ধন্য নরে। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান, অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥

বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ক, ক, ঠ, ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে। হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু, চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥

ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি, ক্রমে বাস পদ্মের উপরে। গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার, আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥

অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ, গুঞ্জে (২) মত্ত

(১) সব্যে—দক্ষিণে।

(২) গুঞ্জে—গুঞ্জরণ করে।

মধুব্রত (৩) স্বরে। ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ, যং রং লং বং হং হোং স্বরে ॥

ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি, চরণ যুগলে সুধাক্ষরে। তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু, এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥

উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ, মহাকালী কাল পদ ভরে। নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই, থাকে জীব, শিব কর তারে ॥

মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে, পুনরপি আসিয়া সংসারে। আজ্ঞা চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ, হংসী রূপে মিল হংস বরে ॥

চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর, দশ শত দল শিরোপরে। শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা, যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ ২১৭ ॥

গৌরচন্দ্রী।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥

---

(৩) মধুব্রত—ভ্রমর।

অতি অবশেষে নিশি, গগণে উদয় শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথারে। আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে। সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে ॥

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে। * * * * ॥

শ্রীরাম প্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্জ চয়, জগত জননী যার ঘরে। কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা, শোয়াইল পালঙ্গ উপরে ॥ ২১৮ ॥

শব সাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো, জগদম্বার কোটাল! জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি, বব বম্ বাজাইয়া গাল ॥

ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে, ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল। অৰ্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে, আপাদ লম্বিত জটা জাল ॥

শমন সমাম দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প, পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল। ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠীতে নারে, সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥

যেজন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে, তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল। মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর, তুই জয়ী ইহ পরকাল ॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে, সাধকের কি আছে জঞ্জাল। বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে, কালীর চরণ করে ঢাল ॥ ২১৯ ॥

শিব সঙ্গীত।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া। শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ভোঁ বমম্ বমম্, বব বম্ ববব বম্ গাল বাজিয়া ॥

মগন হইয়া প্রমথ নাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত, কোটি কোটী কোটী দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া। কটীতটে

কিবা বাঘের ছাল, গলায় দোলিছে হাড়ের মাল, নাগ যজ্ঞো-পবিত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥

শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে, স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া। আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি, প্রজ্জ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥

বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ, শব আভরণ গলায় শেষ, (১) দেবের দেব যোগিয়া। বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি, ধরত তাল দ্রিম্‌কি, দ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়া ॥

বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল, লহরি উঠিছে কল কল কল, জটা জুট মাঝে থাকিয়া। প্রসাদ কহিছে এভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর, কাটীতে নারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া ॥ ২২০ ॥

অন্যবিষয়ক—সঙ্গীত।

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥

(১) শেষ—অনন্ত। বাসুকী।

দুকুল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাঝ্ যমুনার ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রস রাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা, উচিত কি হয়॥ ২২১॥

গুনৌকা বাওহে ত্বরাকরি, নূতন কাণ্ডারী
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে॥
আতব লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী,
চালন কর মনের রঙ্গে।

আপন করহে পণ, চাওহে যৌবন ধন,
হাস ভাষ প্রেম তরঙ্গে ॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোন রূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥ ২২২ ॥

মৃত্যুর প্রাক্কালের সঙ্গীত চতুষ্টয়।

রাগিণী মূলতানী—তাল একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এতনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে। ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥

দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে। শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি, প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥ ২২৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বদানুবাদ করে সকলে ॥

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি ; কেহ বলে সালোক্য (১) পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য (২) মেলে ॥

বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে। ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে ॥

এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে। সে যে সময় হইলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে ॥

প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে। যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে * ॥ ২২৪ ॥

---

(১) সালোক্য—সহলোক। ঈশ্বর সহ এক লোকে বাস।

(২) সাযুজ্য—সহযোগ. ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া সংস্থিতি।

* মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা, কে কি বলিয়াছে বা বলিতে পারে ? ঘট সাকার দেহ, আকাশ নিরাকার আত্মা। এই ঘটের নাশই মৃত্যু। " যা ছিলি ভাই তাই হবি"—যেরূপ আত্মা সেরূপই থাকিবে। " জলের বিম্ব

রাগিণী মুলতানী—তাল একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে;
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়; ওমা
তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথ পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাযাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে;
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥ ২২৫॥

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি; মাগো,
ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥

জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে”—ঈশ্বর জাত আত্মা ঈশ্বরেতেই মিশিবে।

আর যদি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই; মাগো ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥

প্রসাদ বলে মন দঢ়, বক্ষিণায় জোর বড়; মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥২২৬॥